খুদে প্রতিভা • সায়েন্স সঙ্গী • শব্দসন্ধান • নতুন খেলা

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আনন্দমেলা

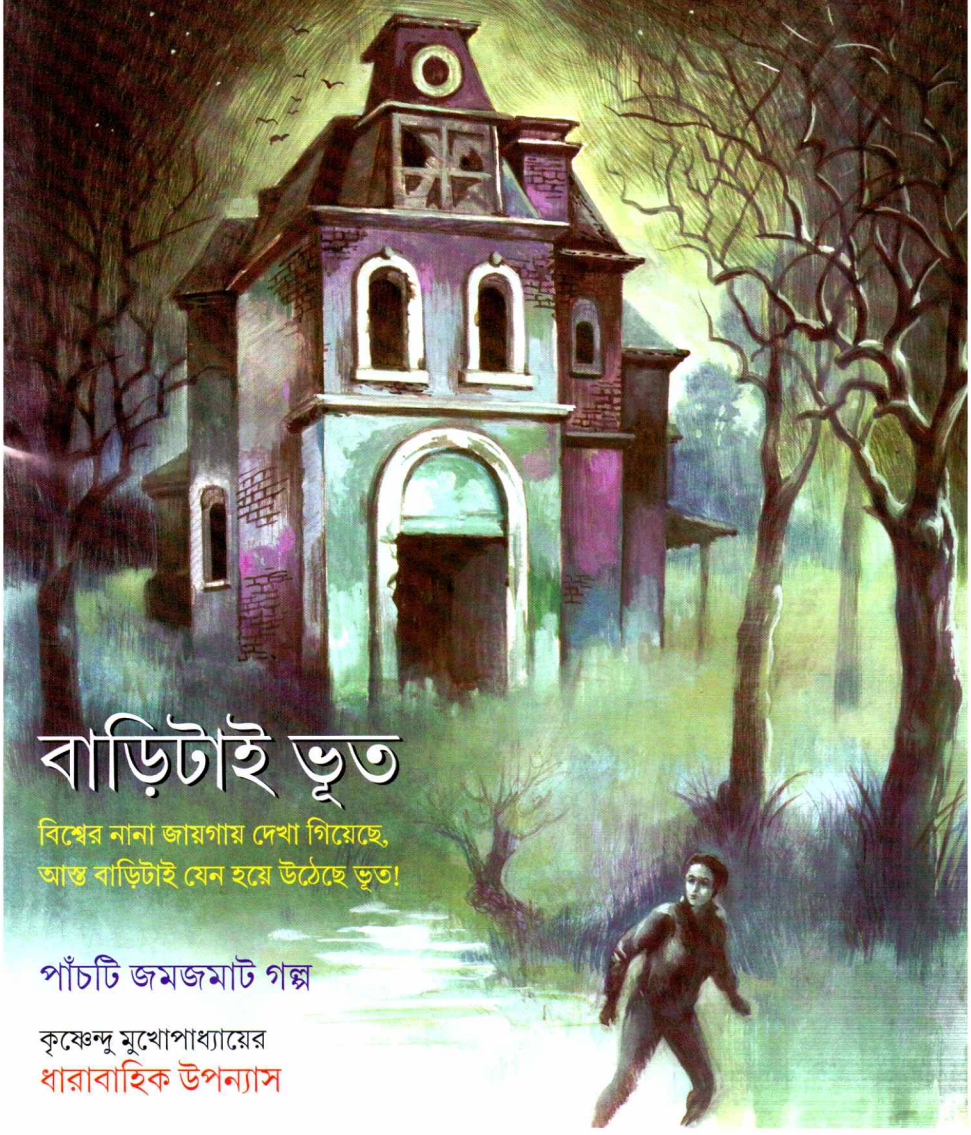

বাড়িটাই ভূত

বিশ্বের নানা জায়গায় দেখা গিয়েছে,
আস্ত বাড়িটাই যেন হয়ে উঠেছে ভূত!

পাঁচটি জমজমাট গল্প

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস

রায় ও মার্টিন®

সহায়িকা

Class 5 to 12

সৌগত দাস
2019 মাধ্যমিকে 1st

ক্যামেলিয়া রায়
2019 মাধ্যমিকে 3rd

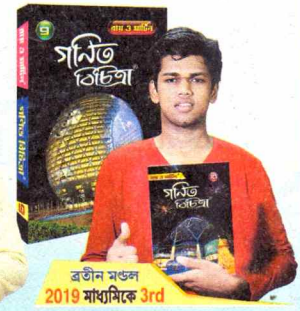

ব্রতীন মণ্ডল
2019 মাধ্যমিকে 3rd

ময়ূরাক্ষী সরকার
2018 মাধ্যমিকে 3rd

মৃন্ময় মণ্ডল
2018 মাধ্যমিকে 3rd

নীলাভ দাস
2018 মাধ্যমিকে 3rd

অন্বেষা পাইন
2017 মাধ্যমিকে 1st

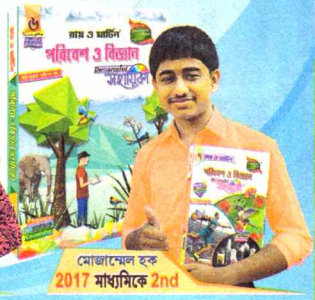

মোজাম্মেল হক
2017 মাধ্যমিকে 2nd

বইমেলায় প্রকাশিত আনন্দ-র নতুন বই

বইমেলায় আনন্দর স্টল নম্বর ১৭৩ এবং সিগনেটের স্টল নম্বর ১৯৪

কমিক্স

অ্যাসটেরিক্স
অ্যাসটেরিক্স ও মুদ্রার কড়াই ২০০.০০

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
ভূস্বর্গ ভয়ংকর ৩০০.০০

ব্যোমকেশ বক্সী কমিক্স
কাহিনি: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
লোহার বিস্কুট, অদ্বিতীয় ২৫০.০০

ডানপিটে রাপ্পা রায় কমিক্স
কাহিনি ও ছবি : সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়
গাড়ির গেরোয় রাপ্পা ১৫০.০০

ছোটদের বই

অংশুমান কর
সাদাকালো কাঠবিড়ালি ২০০.০০

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
বালির পুতুল ২০০.০০

জয় সেন
চন্দ্রকেতুগড়ে আলবেরুনি ৫০.০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
কিশোর গল্পসমগ্র ২ ৪০০.০০
গড় হেকিমপুরের রাজবাড়ি ২০০.০০

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
ব্রহ্মদৈত্যের একাদশ কাহিনি ২০০.০০

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
হেঁসেহারে হুঁশিয়ার ২০০.০০

তিলোত্তমা মজুমদার
অপূর্ব রহস্য ২০০.০০

দীপান্বিতা রায়
ভানুপ্রতাপের রেসিপি ২০০.০০

সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সৌম্যকান্তি দত্ত সম্পাদিত
রেখায় সত্যজিৎ
লেখায় সুনীল ৩০০.০০

অনীশ মুখোপাধ্যায়
অভির স্বপ্ন ২০০.০০

বিপুল দাস
নলিনপুরের রহস্য ২০০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১-৪৩৫২, ২২৪১-৩৪১৭ ই-মেল publishers@anandapub.in
ওয়েবসাইট: www.anandapub.in

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get More
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.allmagazine.in

Click here

আনন্দমেলা

৪৫ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ২১ মাঘ ১৪২৬

প্রচ্ছদ কাহিনি

বাড়িটাই ভূত ৮

কোনওরকম ঠেলা ছাড়াই আপনা থেকে গড়িয়ে পড়ল পেনসিল। কিংবা ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে এধার-ওধার সরে গেল ভারী আলমারি। আস্ত বাড়িটাই যেন একটা অশরীরী অস্তিত্ব। ব্যাপারটা কী? বিশদে লিখেছেন অচ্যুত দাস

জমজমাট পাঁচটি গল্প

মর্ত্য আর নরকের মাঝে
স্বর্ণাংশু নন্দী ১৬

ভূতের ডায়েরি
সুজিত বসাক ২০

ক্লেশদায়ী কেশচর্চা
বিপুল মজুমদার ২৬

সমাধান
অরুণোদয় ভট্টাচার্য ৩৮

ইন্টারভিউ
কৌশিক দাশগুপ্ত ৪২

আনন্দমেলা এবার ওয়েবসাইটে: www.anandamela.in

সূচিপত্র

নিয়মিত বিভাগ

যা হয়েছে যা হবে ৬
মজার ঝাঁপি ১৮
আমার ইচ্ছেমতো ১৯
খুদে প্রতিভা ২৪
আমার ছবি ২৯
আমার স্কুল ৩৬
আমার শিল্পচর্চা ৪১
শব্দসন্ধান, নিজের হাতে ৫১
সায়েন্স সঙ্গী ৫২
আমার কুইজ় ৫৩
ফারাক পাও, সুদোকু ৫৮
নতুন খেলা ৬২

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

মিশন ব্রহ্মনাদ
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩০

খেলাধুলো

রাহুলের দাপট
জয়শিস ঘোষ ৫৯
ছোট-ছোট খেলা
চন্দন রুদ্র ৬০

প্রচ্ছদ: প্রসেনজিৎ নাথ

সম্পাদক: সিজার বাগচী

দাম: কুড়ি টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

যা হয়েছে

করোনাভাইরাসে থরহরিকম্প

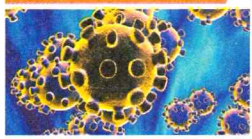

জানুয়ারির শেষদিকে করোনাভাইরাসের দাপটে থরহরিকম্প গোটা বিশ্ব। চিনে প্রথম এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর দেখা মেলে। এই ভাইরাস বিভিন্ন গোত্রের হয়, চিনে পাওয়া ভাইরাসটির নাম নোভেল করোনাভাইরাস। প্রাথমিকভাবে জ্বর, সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট এই ভাইরাস আক্রমণের উপসর্গ। বাড়াবাড়ি হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ইতিমধ্যে চিনে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের, শোনা যাচ্ছে ভারতেও হাজির হয়েছে ভাইরাসটি। এর প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই সতর্কীকরণ হিসেবে বাদুড়, সাপের মাংস না খেতে বলা হচ্ছে, আশঙ্কা করা হচ্ছে তাদের দেহ থেকেই মানুষের শরীরে এসেছে এই ভাইরাস। সংক্রমণ এড়াতে নাক-মুখ ঢেকে রাখার কথাও বলা হচ্ছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে নতুন নজির

প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান আকর্ষণ হল দিল্লির রাজপথে কুচকাওয়াজ। এবছর সেই অনুষ্ঠানে বেশ কিছু নজির তৈরি হল। প্রথমবারের জন্য সেনাবাহিনীর মহিলা আধিকারিক হিসেবে একটি পুরুষদের কুচকাওয়াজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন ক্যাপ্টেন তানিয়া শেরগিল। শুধু তাই নয়, এবারের কুচকাওয়াজে আধা-সামরিক বাহিনীতেও দাপট দেখিয়েছেন মহিলারা। প্রথমবারের জন্য কুচকাওয়াজে অংশ নেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স বা সি আর পি এফ-এর মহিলাদের একটি বাহিনী। বুলেটে সওয়ার হয়ে ৬৫ জনের সেই দলের নানা কসরত মুগ্ধ করেছে সকলকেই।

আফ্রিকার চিতা ভারতে

গত ২৮ জানুয়ারি আফ্রিকার চিতাকে ভারতে নিয়ে আসার অনুমতি দিল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। যথেচ্ছ শিকারের ফলে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ভারতীয় চিতা। সেক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য আফ্রিকা থেকে চিতাবাঘ নিয়ে আসা জরুরি বলে মনে করেন পরিবেশবিদরা। প্রায় দশ বছর আগে এই প্রস্তাব দেওয়া হলেও নানা কারণে এতদিন অনুমতি মেলেনি। এখন অনুমতি মেলায় নামিবিয়া থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চিতা নিয়ে আসা হবে।

ব্রেক্সিটের স্মরণে মুদ্রা

'ব্রেক্সিট' অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন গোষ্ঠী ভেঙে ব্রিটেনের বেরিয়ে আসার ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে ৫০ পেন্সের বিশেষ মুদ্রা নিয়ে এল সে দেশের সরকার। মুদ্রার একপিঠে লেখা রয়েছে 'শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব'। প্রায় ৩০ লক্ষ স্মারক মুদ্রা তৈরি করা হয়েছে। ৩১ জানুয়ারি থেকে এই মুদ্রা ডাকঘর, ব্যাঙ্ক এবং স্মারকের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে।

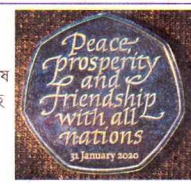

যা হবে

বাণেশ্বর মেলা

আগামী ৫ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের সবলা গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে বাণেশ্বর মেলা। জায়গাটি উদয়পুর থেকে কিছুটা দূরে, দুঙ্গারপুর জেলায়। ওই অঞ্চলে জনপ্রিয় এই মেলাটি প্রধানত ভিল উপজাতির মানুষদের উৎসব। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভিল সম্প্রদায়ের মানুষরা মেলায় আসেন পবিত্র নদীতে স্নান করে পুণ্যলাভের আশায়। এছাড়া মেলায় দেখা যায় আধুনিক বিনোদনের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মিশেল। সেখানে যেমন থাকে ম্যাজিক শো, নাগরদোলা, তেমনই দেখা যায় ভিল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নাচগান, শারীরিক কসরত।

ফানুস উৎসব

আমাদের এখানে কালীপুজোর সময় যেমন ফানুস ওড়ানো হয়, তেমনই ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ ফানুস ওড়ানোর এক বিরাট উৎসব পালিত হয় তাইওয়ানে। চিনাদের চান্দ্র ক্যালেন্ডারের প্রথম মাসের ১৫ তারিখ এই উৎসব শুরু হয়। এবছর অনুষ্ঠান শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি, চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শুধু ফানুস ওড়ানোই নয়, এই উৎসবে রকমারি বাজিও পোড়ানো হয়। প্রথা অনুযায়ী, তাইওয়ানের মানুষ ছোট কাগজে নিজেদের ইচ্ছের কথা লিখে ফানুসে বেঁধে ছেড়ে দেন। তাঁদের বিশ্বাস, এর ফলে সকলের মনের ইচ্ছের কথা ভগবানের কাছে পৌঁছে যায়।

ভেনিস কার্নিভ্যাল

ব্রাজিলের রিও কার্নিভ্যাল জনপ্রিয়তার বিচারে অন্যতম সেরা হলেও, কোনও অংশে কম যায় না ভেনিস কার্নিভ্যাল। ইতালির ভেনিস শহরে এই কার্নিভ্যালের সূচনা হয় পবিত্র ইস্টারের ঠিক ৪০ দিন আগে। এবছর অনুষ্ঠান চলবে আগামী ৮ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি। এই কার্নিভ্যালের জনপ্রিয়তা রকমারি মুখোশের জন্য। প্রতি বছর এই উৎসবে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে। শোনা যায়, এই কার্নিভাল বহু পুরনো, যার সূচনা ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে। বহু শতক সাড়ম্বরে চলার পর অনুষ্ঠানে এক দীর্ঘ ছেদ পড়ে। তারপর আধুনিক সময়ে আবার তা শুরু হয় ১৯৭৯ সালে।

HELPLINE: 033 40433333, 9804033333 (10am to 7pm) | **Whatsapp:** 9674888884 | Email: care@osheaherbals.com
TV PROGRAMME: ZEE BANGLA: Sampurna - 11am Thursday, Friday & Saturday | **CTVN:** Tuesday at 7pm, Wednesday at 1pm, Saturday at 5pm
Colors Bangla: 11:00am Friday | Products also available at: www.osheaherbals.com | Available at leading cosmetic, medical outlets & **Spencers**

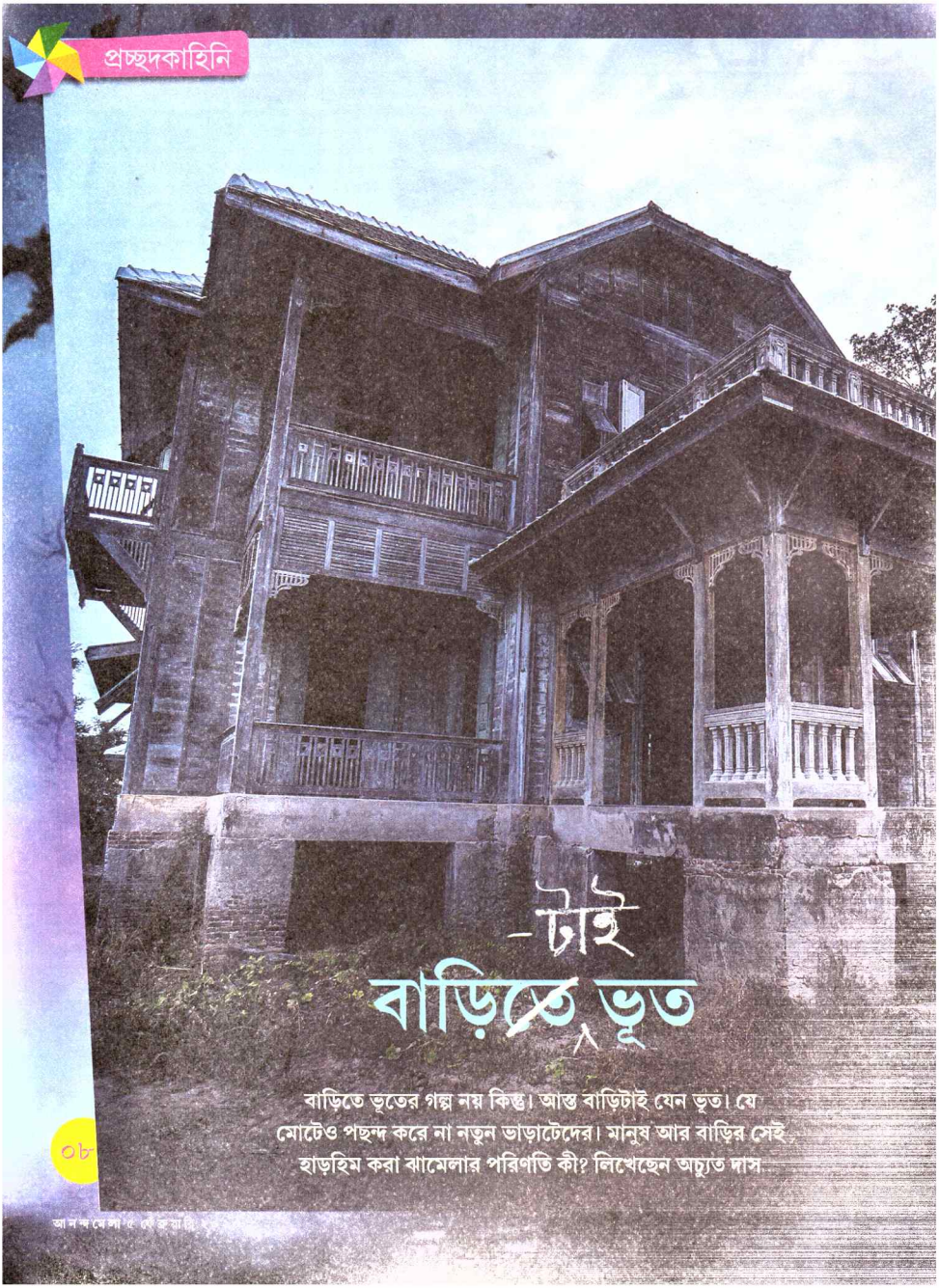

-টাই বাড়িতে ভূত

বাড়িতে ভূতের গল্প নয় কিন্তু। আস্ত বাড়িটাই যেন ভূত। যে মোটেও পছন্দ করে না নতুন ভাড়াটেদের। মানুষ আর বাড়ির সেই হাড়হিম করা ঝামেলার পরিণতি কী? লিখেছেন অচ্যুত দাস

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে দুই বোন রোজকার মতোই নিজের ঘরে শুতে চলে গিয়েছিল। দুই বোনের মধ্যে জেনেট ছোট, তার বয়স সবে ১১। দিদি মার্গারেটে তার চেয়ে বড় মাত্র দু'বছরের। সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ করেই দুই বোনের পরিত্রাহি চিৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে এলেন মা, পেগি হজসন। কী ব্যাপার? দেখা গেল, জেনেট আর মার্গারেট, দু'জনের চোখে-মুখে তখনও লেগে আছে আতঙ্কের টাটকা ছোপ। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে কোনও রকমে দুই বোন মাকে জানাল, রাতদুপুরে হঠাৎ করেই নড়েচড়ে উঠেছে তাদের শোওয়ার খাট। পেগি ঘরে ঢোকার পর অবশ্য খানিকক্ষণ তেমন কোনও অশান্তির দেখা পাওয়া গেল না। পেগি নিশ্চিত হলেন, নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে স্বপ্নটপ্ন দেখেই ভুল ভেবে থাকবে বাচ্চারা। অথচ সে-রাতে ঘটনা যেখানে শেষ বলে পেগি ভাবলেন, আসলে ঘটনার ঘনঘটা শুরু হল ঠিক সেখান থেকেই।

এবার আর বাচ্চাদের মুখে শুনতে হল না। নিজের কানে শুনলেন, নিজের চোখেই যা দেখার দেখলেন পেগি। বাচ্চাদের ঘরে প্রথমে তিনি শুনতে পেলেন দেওয়ালে টোকা মারার আওয়াজ। সেই অবধি তবু ঠিক ছিল, কিন্তু তারপর যখন হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে এক দেওয়াল থেকে আর-এক দেওয়ালে সরে গেল দেরাজওয়ালা ভারী আলমারি, তারপর আর চুপ করে বসে থাকা চলে না। একার হাতে দুই সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে, ওদের হাত ধরে পেগি সাহায্য চাইতে ছুটে গেলেন প্রতিবেশীদের বাড়ি। পাড়াপড়শিরা আন্তরিক, তাঁরা সঙ্গে-সঙ্গেই এগিয়ে এসে পেগির বাড়ি এবং বাগান, দুই জায়গাতেই চিরুনিতল্লাশি চালালেন। সন্দেহভাজন কোনও চোর বা ভিখিরি বা নিদেনপক্ষে একটা ধেড়ে ইঁদুর, খুঁজে পাওয়া গেল না কাউকেই। তবে ওই তল্লাশি করতে গিয়ে প্রতিবেশীরাও শুনতে পেলেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেওয়ালে টোকা মারার শব্দ। এত লোক, সবাই মিলে তো আর ভুল শোনা সম্ভব না। অগত্যা ডাক পড়ল পুলিশের। মজার ব্যাপার, এবার পুলিশের লোকেরাও অশরীরী কার্যকলাপের সাক্ষী রইলেন। ঘরের মধ্যে যা কিছু অশৈলী কাণ্ড ঘটছে, পুলিশ অফিসাররা নিজের চোখেই তার কিছু-কিছু দেখতে পেলেন। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা এলেন। ভূতুড়ে বাড়ি নিরাশ করল না তাঁদেরও। সবার চোখের সামনেই হাওয়ায় ভেসে ঘরের এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় সরে গেল চেয়ার। বাচ্চাদের খেলনা উড়ে-উড়ে ছিটকে পড়ল সারা ঘরের আনাচকানাচে। ফাঁকা ঘরে হঠাৎ করেই ঘেউ-ঘেউ ডেকে উঠল কুকুরের দল। টেবিলের উপর ভাঁজ করে রাখা কাপড়জামা আপন খেয়ালে লন্ডভন্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়ি! যখন-তখন জ্বলা-নেভা করতে থাকল বাড়ির যত আলো। শূন্য থেকে হঠাৎ করে টুং টাং শব্দে ঘরের মেঝেয় ছিটকে পড়ল

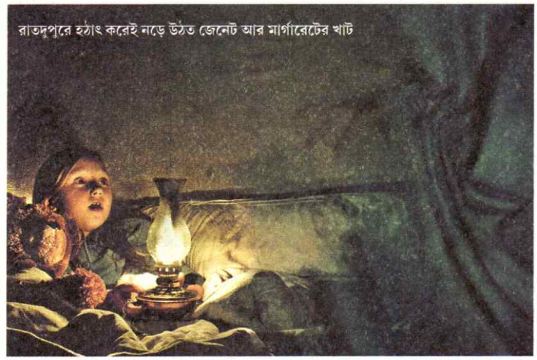
রাতদুপুরে হঠাৎ করেই নড়ে উঠত জেনেট আর মার্গারেটের খাট

ইংল্যান্ডের এপওয়ার্থ রেক্টরি

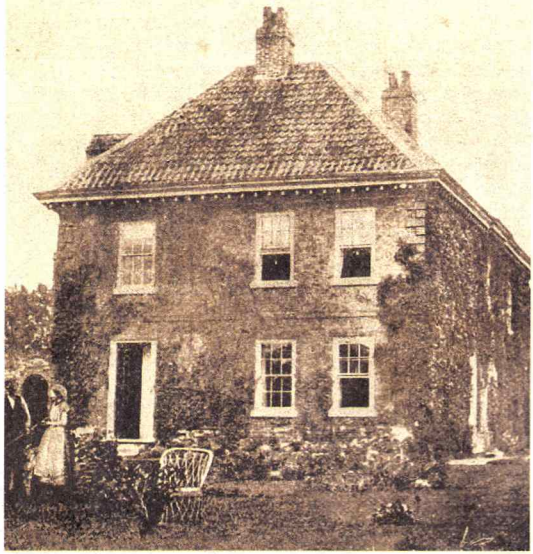

ছোট-বড় কয়েন। বাড়াবাড়ি হল সেদিন, যেদিন দোতলার শোওয়ার ঘরের লোহার চিমনিটা দেওয়াল থেকে উপড়ে এসে পড়ে রইল ঘরের মেঝেয়। খবর পেয়ে সারা পৃথিবী থেকে ছুটে এলেন ভূত-বিশেষজ্ঞরা। শুরু হল ভূতের খোঁজে জোরদার তল্লাশি!

১৯৭৭ সালের অগস্ট মাসে খাস ইংল্যান্ডে এই ঘটনা ঘটল এনফিল্ড নামের এক জায়গায়। পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে যা বিখ্যাত হয়ে থাকবে 'দ্য এনফিল্ড পোলটারগাইস্ট' নামে। জার্মান ভাষায় 'পোলটার্ন' মানে 'শব্দ করা' আর 'গাইস্ট' শব্দের অর্থ 'ভূত'। দু'য়ে মিলে তৈরি শব্দ 'পোলটারগাইস্ট', যার মানে দাঁড়াল 'এমন ভূত, যে শব্দ করে উৎপাত করে'। সাধারণ ভূতের চেয়ে এই ভূত আলাদা, কারণ দেখা গেল, এই ধরনের উৎপাত যে ভূতই করুক না কেন, কোনও না-কোনও কারণে সে বা তারা চাইছে, তার বাড়ি ছেড়ে সকলে চলে যাক। এনফিল্ড পোলটারগাইস্টের বহু আগে, ১৭১৬ সালে ইংল্যান্ডের এপওয়র্থে এমনকী, গির্জার ধর্মপ্রাণ মানুষ, রেভারেন্ড স্যামুয়েল ওয়েসলির বাড়িতেও এরকম ঘটনার সাক্ষী ছিলেন স্যামুয়েলের স্ত্রী ও তাঁদের ১৯ সন্তান। এনফিল্ড পোলটারগাইস্টের গল্পে শেষমেশ কী হল, সেই প্রসঙ্গে আবার পরে একবার আসা যাবে। তার আগে বলি আরও কিছু জগদ্বিখ্যাত বাড়ি-ভূতের কথা।

শ্রীমতী ফোর্বসের মিথ্যে

থর্নটন হিথ। লন্ডনের এই একই জায়গায় দুটো ঘটনা বিখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে সেখানে স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে ঘরসংসার করছিলেন বছর পঁয়ত্রিশের শ্রীমতী ফোর্বস। দিনের পর-দিন তিনি ভূতুড়ে উপদ্রবের মুখোমুখি হচ্ছেন শুনে ঘটনার তদন্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন ব্রিটিশ-মার্কিন প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ নান্ডোর ফোডোর। কিন্তু তদন্তের একেবারে প্রথমদিন থেকেই ডঃ ফোডোরের সন্দেহ হয়, শ্রীমতী ফোর্বস সত্যি কথা বলছেন না! তাঁর অনুরোধে ফোর্বসের তদারকি করার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয় ডঃ ফোডোরের চিকিৎসালয়ে। দেখা যায়, বাড়িতে থাকার সময় যে সমস্ত উপদ্রব শ্রীমতী ফোর্বসকে ঘিরে ঘটছিল, সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে চিকিৎসালয়েও। কারও কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে বেড়াতে শুরু করে থালা-বাটি-প্লেট, শ্রীমতী ফোর্বসের হাতে ধরা জলের গ্লাস নিজে থেকেই ছিটকে বেরিয়ে আছড়ে পড়ে মেঝেয়, দশ মাইল দূরে ফোর্বসের বাড়ি থেকে উধাও হওয়া কিছু জিনিস হঠাৎ করেই পাওয়া যায় চিকিৎসালয়ে, ফোর্বসের নিজের ঘরে।

ডঃ ফোডোর অবশ্য তখনও নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। ততদিনে ফোর্বসের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পেরেছেন, ছেলেবেলায় নানা অশান্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ফোর্বসকে। তার জেরেই কি ফোর্বসের এই মানসিক বিকার? তাই যদি হয়, সকলের চোখের সামনে দেখতে

পোলটারগাইস্ট ছবির পোস্টার

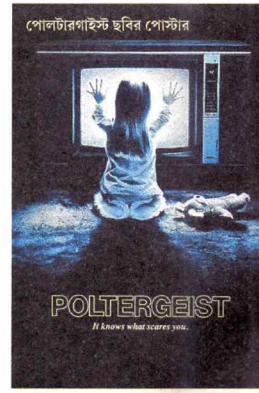

পাওয়া আজগুবি ঘটনাগুলোর তা হলে ব্যাখ্যা কী? ফোর্বস নিজেই কিছু কারচুপি করছেন, এই বিশ্বাস মনের মধ্যে চেপে বসায় ডঃ ফোডোর নির্দেশ দিলেন, শ্রীমতী ফোর্বসকে এমন পাতলা জামাকাপড় পরতে দিতে, যাতে জামাকাপড়ের ভাঁজে তিনি কিছু লুকিয়ে রাখতে না পারেন। তাতে কিন্তু অশৈলী কাণ্ডকারখানা থামল না। উলটে শ্রীমতী ফোর্বসের হাতে-পায়ে

পেরন পরিবারের অভিশপ্ত বাড়ি

প্রায়ই দেখা যেতে থাকল আঁচড়-কামড়ের ক্ষতস্থান। কারণ জিজ্ঞেস করলে ফোর্বস জোর দিয়ে বললেন, রাতের বেলা কখনও একটা ভয়ানক বাঘ, কখনও আবার আস্ত এক ভ্যাম্পায়ার এসে আহত করেছে তাঁকে। তিতিবিরক্ত ফোডোর বাধ্য হয়ে শ্রীমতী ফোর্বসকে ভাল করে তল্লাশি করার ব্যবস্থা করলেন। তাতেও কিচ্ছুটি পাওয়া গেল না। মরিয়া ফোডোর তখন নিদান দিলেন এক্স রে-র! সেই এক্স রে রিপোর্ট সামনে আসতেই মান্যতা পেল ডঃ ফোডোরের দাবি। দেখা গেল, সবার নজর এড়িয়ে সত্যিই নিজের শরীরের ভাঁজে নানা জিনিস লুকিয়ে রাখেন শ্রীমতী ফোর্বস। প্রমাণিত হল যে ছোটবেলার অশান্তিগুলোই অবচেতনে বাসা বেঁধে ছিল শ্রীমতী ফোর্বসের। তা থেকেই তাঁর যত উদ্ভট কল্পনা, তা থেকেই সবার চোখে ধুলো দিয়ে তিনি তৈরি করতেন ভূতুড়ে ঘটনার আবহ।

ভাড়াটে উচ্ছেদ

এই ঘটনাটাও ওই একই জায়গার। থনটন হিথ। আগের ঘটনাটার পর পেরিয়ে গিয়েছে গোটাতিরিশ বছর। ১৯৭২ সালের অগস্ট মাসে সেখানকার এক বাড়িতে রাতদুপুরে হঠাৎ করেই বেজে উঠল রেডিয়ো! চ্যাঁ চোঁ শব্দে রেডিয়োর কাঁটা নড়েচড়ে উঠে অবশেষে এসে থামল বিদেশি ভাষার এক স্টেশনে। সেই যে শুরু, তারপর টানা চার বছর ধরে অতিপ্রাকৃতিক, আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটতে থাকল ওই বাড়িতে। সেবছর বড়দিনে ঘরের মধ্যেই থরথর করে কেঁপে উঠল ক্রিসমাস ট্রি। কোত্থেকে কে জানে, একটা গয়না এসে ধাঁই করে লাগল পরিবারের কর্তার কপালে। বড়দিনের পরেই নববর্ষ। নতুন বছরে পরিবারের সবাই একটু আনন্দ উৎসব করবে, তার উপায় নেই। শোওয়ার ঘরে কেউ না ঢুকলেও মেঝেয় দিব্যি পাওয়া গেল মানুষের পায়ের ছাপ। রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে উঠে পরিবারের সবচেয়ে খুদে সদস্য ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে-যেতে দেখল, তার ঠিক সামনেই পুরনো দিনের জামাকাপড় গায়ে দিয়ে, রাগী-রাগী চোখ-মুখে তার দিকেই তাকিয়ে আছেন এক ভদ্রলোক! এক রাতে পারিবারিক বন্ধুদের ডাকা হয়েছে বাড়িতে, হঠাৎ করেই জোরে-জোরে টোকা পড়তে শুরু করল বাড়ির মূল দরজায়, দুমদাম জ্বলে উঠল সারা বাড়ির আলো। ভয় পেয়ে বাড়ির বাসিন্দা সেই পরিবার গির্জার কাছে সাহায্য চাইলে। সেইমতো একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হল বটে বাড়ির, কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ কিছু হল না। উলটে রাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওই পরিবারের কর্ত্রী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, তার ঠিক পিছনেই হেঁটে-হেঁটে আসছেন ধূসর চুলের এক বৃদ্ধা। মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই

এড ও লোরেন ওয়ারেন

এনফিল্ডের সেই ভূতুড়ে বাড়ি, এখন যেমন

অবশ্য সব ভোঁ ভাঁ।

উপায়ান্তর না পেয়ে শেষে ডেকে আনা হল একজন 'মিডিয়াম'-কে। অশরীরীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানালেন, এই বাড়ি যে জমিতে, অষ্টাদশ শতকে তা ছিল এক কৃষক ও তাঁর স্ত্রীর। তাঁদের অতৃপ্ত আত্মাই এই বাড়িতে অন্য কাউকে থাকতে দিতে নারাজ। প্রথমে শুধুই কৃষকের ভূত বেগড়বাই করলেও সদ্য সেই দলে যোগ দিয়েছেন তাঁর মৃত স্ত্রীও! খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সত্যি-সত্যিই অষ্টাদশ শতকে ওখানে এক কৃষক ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন। এক রাতে বাড়ির সবাই বসে টিভি দেখছেন, হঠাৎ টিভির পরদায় ভেসে উঠল সেই কৃষকের মুখ। আশ্চর্যের ব্যাপার, টানা চার বছর উপদ্রব সহ্য করার পর যখন সেই পরিবারটি অবশেষে বাড়ি ছেড়ে দিলেন, তারপর থেকে আর কখনওই সেখানে কোনও ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেনি। বাড়ির পরবর্তী ভাড়াটেরাও কোনও অলৌকিক কাণ্ড দেখতে বা শুনতে পাননি।

খাটে শোওয়া বারণ

১৯৯৮ সালে সাভানা মর্নিং নিউজ়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এই ঘটনার কথা। ঘটনাটা অ্যাল কব নামের এক ভদ্রলোক আর তাঁর ছেলের। মার্কিন মুলুকের জর্জিয়ায় সাভানা নামের শহরে অ্যাল কব তাঁর নিজের ছেলেকে বড়দিনের উপহার দেবেন বলে এক নিলাম থেকে কিনেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা খাট। সেই খাটে শুতে শুরু করার তিন রাত পর অ্যাল কবের ১৪ বছরের ছেলে জেসন তাঁর বাবা-মাকে জানায়, রাতে শোওয়ার পর তার বিছানায় কনুই রেখে কেউ যেন শুয়ে থাকে তার ঠিক পাশেই। ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে না পেলেও অশরীরীর বরফ-ঠান্ডা নিশ্বাস কিন্তু এসে লেগেছে তার ঘাড়ে-পিঠে। ঠিক তার পরের রাতে জেসনের সেই খাটের পাশে টেবিলে রাখা তার দাদু-দিদিমার বাঁধানো ফোটোটা উলটে পড়ে থাকতে দেখা গেল। ফোটোফ্রেমটা জেসন তক্ষুনি সোজা করে দিলেও পরদিন আবার দেখা গেল, সেটা উলটেই পড়ে আছে। সেদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে নিজের ঘরে ফিরে জেসন দেখতে পায়, তার সারা খাট জুড়ে ছড়িয়ে আছে ছোট বাচ্চার নানা খেলনা। ঘটনা দেখে ক্যাসপার নামের জগদ্বিখ্যাত খুদে ভূতের নাম ধরে অ্যাল কব চিৎকার করে উঠলেন, "এখানে কি একজন ক্যাসপার আছে? নিজের নাম আর বয়স বলো আমাদের!" এই বলে ঘরে কিছু কাগজ আর রং-পেনসিল রেখে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিটপনেরো বাদে

কনজুরিং ছবির দৃশ্য

ফিরে এসে সবাই দেখলেন, লম্বা-লম্বা হরফে কোনও বাচ্চা লিখে দিয়ে গিয়েছে প্রশ্নের উত্তর, 'ড্যানি, সাত'।

পরিবারকে তড়িঘড়ি অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেও অ্যাল কব নিজে সেই বাড়িতেই থেকে ভূতের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে থাকলেন। ক্রমশ জানা গেল, ড্যানি নামের সেই বাচ্চার মা ১৮৯৯ সালে ওই খাটেই মারা গিয়েছিলেন। ওই খাটে অন্য কাউকেই শুতে দিতে ড্যানি তাই নারাজ। 'বিছানায় কেউ ঘুমোবে না' লেখা চিরকুটও পাওয়া গেল। আমল না দিয়ে জেসন তবু জোরজবরদস্তি ওই খাটে শুতে গেলে একটা টেরাকোটার মূর্তির মাথা হঠাৎ ঘরের দেওয়াল থেকে সোজা উড়ে এল তার মাথা লক্ষ করে। জেসনের কপাল ভাল, তার মাথায় না লেগে মূর্তির মাথাটা সোজা আছড়ে গিয়ে পড়ল আলমারির গায়ে।

সাভানা মর্নিং নিউজে এই ঘটনার কথা লিখেছিলেন জেন ফিশম্যান, "কে বা কী যে চিরকুট ফেলছিল, আসবাবপত্র সরাচ্ছিল, রান্নাঘরের আলমারি খুলছিল, ডাইনিং রুমে টেবিল সাজাচ্ছিল, চেয়ার উলটে ফেলে দিচ্ছিল, মোমবাতি জ্বালাচ্ছিল, পোস্টার উলটেপালটে সাজিয়ে চেষ্টা করছিল অন্য কারও নাম বলার... আমরা কেউ বুঝতে পারিনি।"

পরবর্তীকালে জেসন ধীরে-ধীরে আঙ্কলস্যাম, গ্রেসি এবং জিল নামে আরও তিন অশরীরীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে বলে জানিয়েছিল। যদিও ঘটনার তদন্তে নেমে প্যারাসাইকোলজিস্ট অ্যান্ড্রিউ নিকোলস্ নিদান দেন, জেসনের বাড়ির ওই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই নিলামে কেনা সেই খাটের। তাঁর মতে, জেসনের ঘরের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার ওই ঘরে তৈরি করেছিল প্রবল তড়িচ্চৌম্বকীয় ক্ষেত্র। তার প্রভাবেই জেসনের মধ্যে কিছু অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার উদয় হয়, যার জেরে তার পক্ষে

থনটন হিথের বাড়ির টিভিতে ফুটে উঠত মৃত কৃষকের মুখ

রজার বাদে পেরন পরিবারের বাকিরা, ১৯৭১ সালে

অশরীরী উপস্থিতি টের পাওয়া হয়ে গিয়েছিল অনেক সহজ।

পেরন পরিবারের গল্প

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন মুলুকের রোড আইল্যান্ডে চোদ্দোখানা ঘরের এক মস্ত বড় ফার্মহাউজে থাকতে শুরু করেন ক্যারোলিন, রজার এবং তাঁদের পাঁচ মেয়ে। প্রথম-প্রথম যখন বাড়ির ঝাঁটা হারিয়ে গেল, রান্নাঘরে কেউ না থাকলেও পাওয়া গেল কেটলির গায়ে কিছু ঘষার আওয়াজ, কেউ অতটা গা করেননি। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল বাড়ির আনাচকানাচে অশরীরীদের আসা-যাওয়া, তারপরেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার উপায় রইল না। ক্যারোলিন খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন, তাঁদের আগে এই বাড়িতে ছিলেন একই পরিবারের আট প্রজন্ম, যাঁদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল রহস্যজনকভাবে। বাড়ির কাছেই এক খাঁড়িতে বেশ কিছু বাচ্চা ডুবে মারা গিয়েছিল। একটি বাচ্চাকে খুন করা হয়েছিল। কয়েকজন বাচ্চা আত্মহত্যা করেছিল চিলেকোঠার ঘরে। ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে এ-ও জানা গেল যে, ব্যাথশিবা নামের এক রহস্যজনক মহিলা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ওই জমিতেই থাকতেন, যাঁর বিরুদ্ধে বাচ্চা খুনের অভিযোগ উঠেছিল। এহেন গা-ছমছমে অতীতের সাক্ষী সেই বাড়িতে ব্যাথশিবার উপস্থিতি অনুভব করার পাশাপাশি মাঝে-মাঝেই পচা মাংসের গন্ধ পেতেন ক্যারোলিন ও তাঁর পরিবার। আসবাবপত্র

টানা ১০ বছর ভুতুড়ে বাড়িতে ছিল পেরন পরিবার

ছাড়াও বাড়ির বিছানাও কোনও-কোনও রাতে ভেসে উঠত শূন্যে।

গল্পটা চেনা-চেনা লাগছে কি? ২০১৩ সালে হলিউডি ছবি 'দ্য কনজুরিং'-এ দেখানো হয়েছিল ঠিক এই গল্পটাই। পেরন পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি ছবিতে দেখানো হয়েছিল এডওয়ার্ড ওয়ারেন মিনে এবং লোরেন রিটা ওয়ারেন নামের এক স্বামী-স্ত্রী জুটিকে। এই এড আর লোরেন ছিলেন অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার তদন্তকারী। ১৯৫২ সালে মার্কিন মুলুকের নিউ ইংল্যান্ডে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নিউ ইংল্যান্ড সোসাইটি ফর সাইকিক রিসার্চ', ভূতান্বেষণের এক আদি প্রতিষ্ঠান। পেরন পরিবারের অনুমতি নিয়ে একবার তাঁদের বাড়ি গিয়ে লোরেন ক্যারোলিনের মাধ্যমে ভূত নামানোর চেষ্টাও করেছিলেন। সেই দৃশ্য লুকিয়ে-লুকিয়ে নিজের চোখে দেখে ফেলেছিল ক্যারোলিনের বড় মেয়ে অ্যাড্রিয়া, "মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাব। মা অচেনা কণ্ঠস্বরে, অজানা ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল। তার পরেই মায়ের চেয়ার হঠাৎ শূন্যে ভেসে ওঠে আর মাকে ছিটকে ফেলে ঘরের এক প্রান্তে।"

এই ঘটনার পরই এড আর লোরেনকে এই তদন্ত বন্ধ করতে নির্দেশ দেন রজার। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, এড-লোরেনের পাল্লায় পড়ে ক্যারোলিনের মাথা আরও বিগড়ে যাচ্ছে। টাকাপয়সার টানাটানির জন্য বাধ্য হয়ে ওই ভূতুড়ে বাড়িতেই টানা দশ বছর থাকতে হয়েছিল পেরন পরিবারকে। ১৯৮০ সালে বাড়ি ছেড়ে তাঁরা যখন অন্যত্র চলে গেলেন, তারপর থেকেই বাড়িতে ভূতের উপদ্রবও গেল বন্ধ হয়ে।

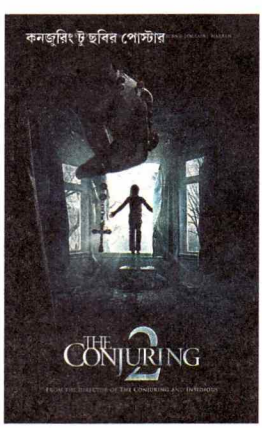

কনজুরিং টু ছবির পোস্টার

সত্যিটা কী?

বিখ্যাত পোলটারগাইস্টদের কথা বলতে বসলে গল্প সহজে ফুরোনোর নয়। বহু ঘটনাই ক্ষণিকের বুড়বুড়ি তুলে সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে হারিয়ে যায় মানুষের স্মৃতি থেকে। আর যে ঘটনাগুলো খুব সহজে 'নেহাত গুল!' বলে ঝেড়ে ফেলা যায়নি, জগদ্বিখ্যাত তেমন কয়েকটা ঘটনার কথাই তোমাদের বললাম। বললাম হলিউডি সিনেমার কথাও। 'পোলটারগাইস্ট' নামেই হলিউডে একটা ছবি বেরিয়েছিল ১৯৮২ সালে। বিখ্যাত পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের ইচ্ছে ছিল ছবিটা পরিচালনা করার। কিন্তু সেসময় অন্য একটা ছবির শুটিংয়ে হাত

দিয়ে দিয়েছিলেন বলে শেষমেশ তাঁর জায়গায় ছবি পরিচালনা করেন টোবি হুপার। স্পিলবার্গ থেকে যান ছবির প্রযোজক, গল্পকার ও চিত্রনাট্যকার হয়ে। রহস্যঘন, হাড়হিম করা সেই ছবি এতই জনপ্রিয়তা পায় যে দর্শকদের চাহিদা মাথায় রেখে ছবির আরও দু'টি পর্ব মুক্তি পায় ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে। একেবারে হালে, ২০১৫ সালে ১৯৮২-তে মুক্তিপ্রাপ্ত মূল ছবিটিকেই নতুন করে একবার তৈরি করাও হয়েছে।

সিনেমার পরদা থেকে আবার একবার ফিরে আসি এনফিল্ড পোলটারগাইস্টের সেই গল্পটায়, যা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। হলিউডি ছবি কনজুরিংয়ের দ্বিতীয় পর্ব ওই ঘটনাটা নিয়েই। মার্গারেট আর জেনেট নামের দুই বোন ছাড়াও এনফিল্ডের ওই বাড়িতে ছিল পেগি হজসনের আরও দুই সন্তান, দশ বছর বয়সি জনি এবং সাত বছরের বিলি। যদিও অলৌকিক কাণ্ডকারখানাগুলোর অধিকাংশই ঘটত জেনেটকে ঘিরে। বাড়ির বাকি সদস্যরা অনেক সময়ই জেনেটকে শূন্যে ভেসে বেড়াতেও দেখেছিলেন বলে শোনা যায়। ২০১৬ সালে যখন সারা বিশ্বের সিনেমা হলে 'কনজুরিং টু' মুক্তি পেল, বিশেষ করে সেসময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, নিউজ় চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন প্রায় ৫০ বছর বয়সি জেনেট। এনফিল্ডের সেই রহস্যময় বাড়ির প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয় না ও (সেই অশরীরী) আমাদের ক্ষতি করতে চাইত। আসলে আমার ওই নিয়ে বেশি ভাবতে ইচ্ছে করে না। তবে ও আর যাই হোক, শয়তান ছিল না বলেই আমার মনে হয়। মাঝে-মাঝে মনে হত, ও-ও চায় আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হতে।"

খটকাটা এখানেই। দশ-পনেরো বছরের বাচ্চারা দৌড়ে এসে 'ভূত দেখেছি!' বললে বড়রা সাধারণত হেসে উড়িয়েই দেন। কিন্তু চল্লিশোর্ধ্ব মানুষজনও ঘটনার এত বছর পর বেমালুম মিথ্যে বলবেন? কেন? যাঁরা এই ধরনের ঘটনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁদের মধ্যে কোনও-কোনও প্যারাসাইকোলজিস্টের মতে, অতিপ্রাকৃতিক কোনও শক্তি বা আত্মার প্রভাবেই এমন ঘটনা ঘটতে পারে। কারও মতে আবার, কোনও বিশেষ জায়গায় অচেনা শক্তির প্রভাবেও এ ধরনের ঘটনা দেখা যেতে পারে। আর যে-কোনও ঘটনাকে বিজ্ঞানের যুক্তিনির্ভর আতসকাচের তলায় না ফেলে যাঁরা খালি চোখে বিশ্বাস করতে পারেন না, সেই প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীদল কী বলছেন?

তাঁরা শুধু বলছেন, তা কিন্তু নয়। নানা ঘটনায় বিভিন্ন 'আক্রান্ত'র সঙ্গে কথা বলে তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, প্রায় সমস্ত ঘটনাতেই আক্রান্ত ব্যক্তি তাঁর নিজের জীবনে কোনও না-কোনও সময় ছোট-বড় কোনও মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। অবচেতনে থেকে যাওয়া সেই 'আতঙ্ক'-ই বারবার ফিরে-ফিরে আসে তাঁদের জীবনে। এই 'আক্রান্ত'রা নিজের অজান্তেই বিশ্বাস করতে শুরু করেন এবং নিজের আশপাশের লোকজনকেও বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেন, তাঁরা মিথ্যুক নন। বরং সত্যিই তাঁদের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। সকলের অজান্তে যেমনটা হয়েছিল অনেক বছর আগে।

পোলটারগাইস্ট মানে কি শুধুই তাই? নাকি আমাদের বিশ্বাস আর যুক্তি ছাপিয়ে সত্যিই আছে কোনও অন্য জগৎ? মৃত্যুর পরেও যে জগতের বাসিন্দাদের গোঁসা হলে কেঁপে ওঠে এ-জগতে আমাদের ঘরবাড়ি! মাঝরাতে হঠাৎ করেই দমকা হাওয়ায় নড়ে ওঠে জানলার পরদা! কেউ ঘরে না-ঢুকলেও ঠক করে টেবিলের উপর থেকে নীচে পড়ে যায় নতুন পেনসিল বক্স। এই লেখা পড়তে-পড়তে ঘাড়ের কাছে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলার শব্দ হয় কার যেন...

আমাদের বিশ্বাস আর যুক্তি ছাপিয়ে সত্যিই আছে কোনও অন্য জগৎ?

হজসন পরিবারের এক সদস্যার 'ওড়া'-র বিতর্কিত ফোটো

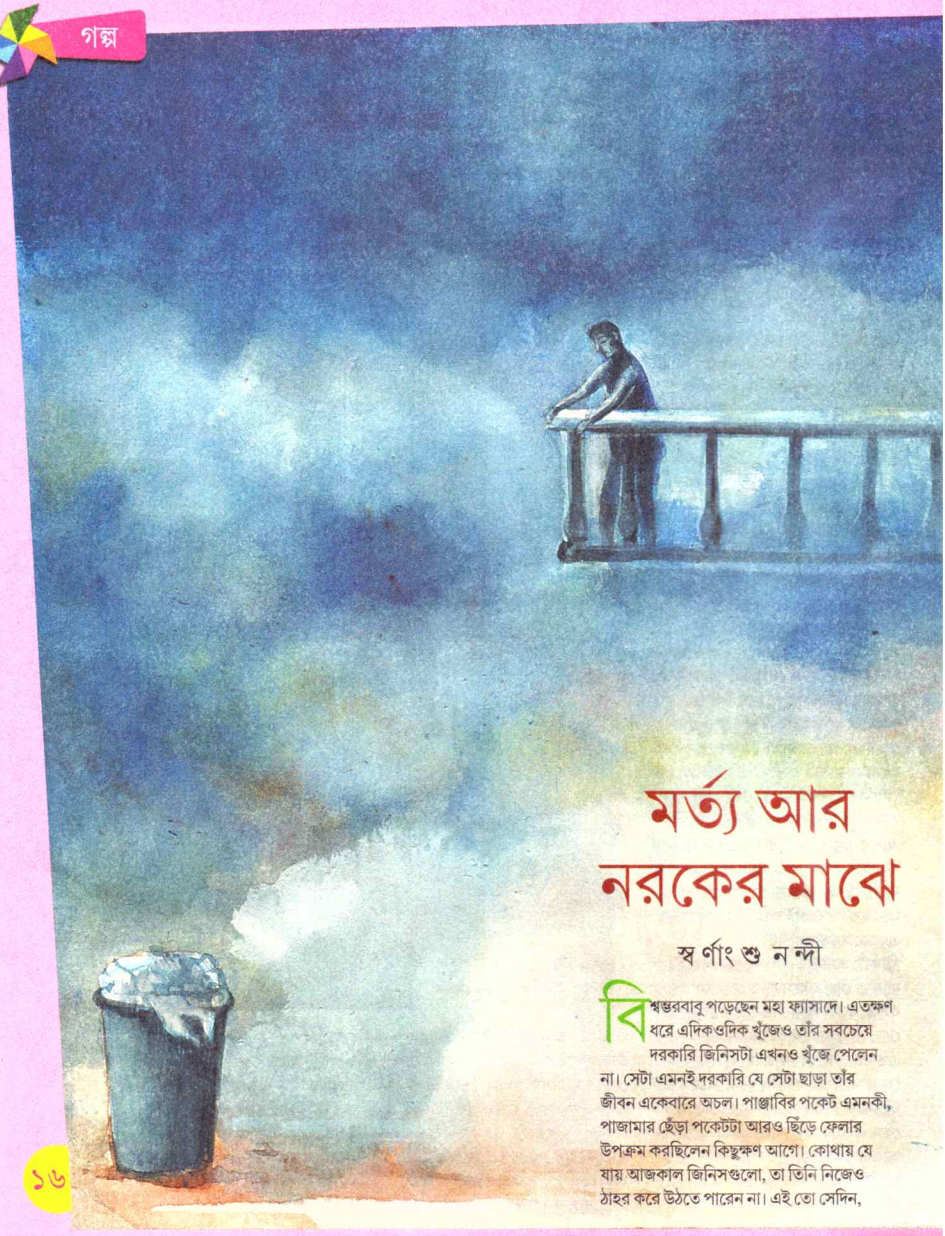

মর্ত্য আর নরকের মাঝে

স্বর্ণাংশু নন্দী

বিশ্বম্ভরবাবু পড়েছেন মহা ফ্যাসাদে। এতক্ষণ ধরে এদিকওদিক খুঁজেও তাঁর সবচেয়ে দরকারি জিনিসটা এখনও খুঁজে পেলেন না। সেটা এমনই দরকারি যে সেটা ছাড়া তাঁর জীবন একেবারে অচল। পাঞ্জাবির পকেট এমনকী, পাজামার ছেঁড়া পকেটটা আরও ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করছিলেন কিছুক্ষণ আগে। কোথায় যে যায় আজকাল জিনিসগুলো, তা তিনি নিজেও ঠাহর করে উঠতে পারেন না। এই তো সেদিন,

ভাত খেয়ে উঠে জোয়ানের শিশিটা নিয়ে ছাদে উঠছিলেন, বেশ ফুরফুরে হাওয়া খেতে-খেতে জোয়ানের নুন-লেবুর স্বাদ নেবেন বলে। ছাদে গিয়ে খেয়াল হল, হাতে জোয়ানের শিশিটাই নেই! কোথায় যে ফেলে এলেন, কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছিলেন না। শেষে তাঁর দু'দশকের কেয়ারটেকার শিবু ডাস্টবিন থেকে তা উদ্ধার করে আনে। তারপর মালুম হয় যে, একহাতে টুথপিক আর অন্যহাতে শিশিটা ছিল, দাঁত থেকে মাংসকুচিটা বের করার পর সেটা পকেটে পুরে শিশিটা ছুড়ে দিয়েছিলেন সোজা ডাস্টবিনে, একান্তই ভুলবশত। প্রায় প্রতিদিনই এরকমটা ঘটে যায়। বড় অস্থির লাগে, কিন্তু উপায় নেই। তাই এসব ব্যাপারে আর তেমন মাথা ঘামান না বিশ্বম্ভরবাবু। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁর গিন্নি প্রায়শই বলেন, "তুমি মরলেও এ হারানোর রোগ তোমার যাবে না। তুমি মিলিয়ে নিয়ো।"

চারদিকে ছোটাছুটি করছেন তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হল। কত লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, একটু এগিয়েও আসছে না।

'কোন জগতের মানুষ রে বাবা সব!' বিড়বিড় করে আওড়াতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর এক যন্ডামার্কা লোক এসে তাঁর পিঠে হালকা চাপড় মেরে জিজ্ঞেস করেন, "কিছু খোয়া গিয়েছে নাকি মশাইয়ের?"

তাকে দেখে প্রথমে খানিকটা চমকে ওঠেন বিশ্বম্ভরবাবু। কেমন একটা অসুর-অসুর চেহারা, দু'হাতে মোটা সোনার বালা, মাথায় বিশাল মুকুট, তাতে আবার মণিমাণিক্য জ্বলজ্বল করছে।

'লোকটার মাথাটা বোধ হয় একেবারেই গিয়েছে, নইলে এই রাতে এসব সোনার জিনিস পরে কেউ বেরয়?' এমনটা যেমনি ভাবা অমনি সেই লোকটা গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "কী ভাবছেন মশাই?"

একটু থতমত খেয়ে বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "না মানে... ইয়ে, একটা দরকারি জিনিস হারিয়ে ফেলেছি।"

"ও আর পাবেন না, ওকথা ভুলে যান। তা, মশাইকে আগে তো এ তল্লাটে দেখিনি। নতুন আমদানি?"

"মানে? আমি এখানকার চারপুরুষের বাসিন্দা। বরং আপনাকেই তো প্রথম দেখছি।"

"বলেন কী? চারপুরুষ! এতদিন তো এখানে কাউকে রাখা হয় না! সব পোস্টই তো এখানে ট্রান্সফারেব্‌ল!"

"ধুর! কীসব বকছেন বলুন তো!"

"আচ্ছা দাঁড়ান, বলুন তো এ জায়গাটার নামটা কী?"

"কী আবার? মেহেরগাঁ।"

বিশ্বম্ভরবাবুর একথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন অতিকায় চেহারার লোকটা। বেশ খানিক পরে হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, "ঠিক ধরেছি, আপনিও স্লিপিং কেস। আপনাকে নিয়ে এ পক্ষে দশটা এই কেসের আমদানি হল।"

হাসির চোটে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বিশ্বম্ভরবাবু। একটু আমতা-আমতা করে বললেন, "ইয়ে... মানে, একটু খোলসা করে বলুন তো। আমার কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা-আচ্ছা, অত টেনশনের কোনও কারণ নেই। বলেই ফেলি তবে, কী বলেন?"

"হ্যাঁ, এবার একটু ঝেড়ে কাশুন তো। এমনিতেই আমার মাথাটা তখন থেকে বিগড়ে আছে, আপনি আর মাথা খাবেন না মশাই।"

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে অসুরসদৃশ সেই লোকটা সমস্তটা বুঝিয়ে বললেন বিশ্বম্ভরবাবুকে, "আসলে যারা ঘুমের মধ্যে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে আমাদের শহরে পা রাখেন, সেই কেসগুলোকে আমরা খাতায়-কলমে স্লিপিং কেস বলি, আপনিও সেরকম আর কী।"

"মানে? ইহজগৎ ত্যাগ করে..."

"হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। আপনি এখন আর মেহেরগাঁয়ে নেই। ওই দেখুন, বোর্ডে কী লেখা আছে।"

অল্প আলো হলেও বেশ ভালই পড়া যাচ্ছে দূর থেকে। বিশ্বম্ভরবাবু বিড়বিড় করে পড়লেন, "ওয়েলকাম টু নরক, টাউন অফ মিস্টেক্‌স।"

"মানে? আমি আর বেঁচে..."

"না, নেই। আপনার দু'চোখ ওখান থেকে বুজিয়ে এখানে ট্রান্সফার করা হয়েছে। আর আপনি জীবিত অবস্থায় ভুল করে অনেক ভুল করতেন বলেই আপনি এই টাউন অফ মিসটেক্‌সে।"

"তবে যে আমি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে বেরলাম!"

"ওটা ইলিউশন। ততক্ষণে আপনার এখানে আসার টিকিট কনফার্ম হয়ে গিয়েছিল, বুঝলেন?"

এতক্ষণে কিছুটা হলেও বিশ্বম্ভরবাবুর বিশ্বাস হয়েছে যে, আর যাই হোক, তিনি আর মেহেরগাঁয়ে নেই। তিনি তাঁর আফসোসটা আর চেপে রাখতে পারলেন না। বলেই ফেললেন, "যাহ! এবার কী হবে? তবে কি ওটা আর পাওয়া যাবে না?"

"কী? কী পাওয়া যাবে না? এবার বলে ফেলুন দেখি, কী খুঁজছিলেন?"

আর লুকিয়ে কোনও লাভ নেই দেখে করুণ স্বরে মুখটা বাংলার পাঁচের থেকেও সামান্য বেঁকিয়ে বলেই ফেললেন বিশ্বম্ভরবাবু, "আমার চশমা।"

"অ্যাঁ!" এমন জিনিসও কেউ এমনভাবে হন্যে হয়ে খুঁজতে পারে, তা জানা ছিল না নরকের অসুরকায় বাসিন্দাটির।

"শেষমেশ চশমা খোয়ালেন মশাই! তা এখানে তো ও জিনিস পাবেন না। তবে আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু আপনি তো আসল জিনিসটাই হারিয়ে

ফেলেছেন!"

"তবে এখন উপায়? আমি তো এক মুহূর্তও থাকতে পারব না। এ তো দেখছি মরেও শান্তি নেই!"

"হুম, একটা উপায় আছে।"

একথা শুনে যেন হালে পানি পেলেন বিশ্বম্ভরবাবু। তাঁর চোখদুটো বড়-বড় রসগোল্লার মতো হয়ে উঠল উৎসাহে।

"বলুন, বলুন, কী উপায়?"

"ওই যে সামনে একটা এক্সচেঞ্জ কাউন্টার দেখছেন, ওখান থেকে একটা টোকেন নিয়ে একবার মর্ত্য থেকে ঘুরে আসুন। দেখুন ওখানে পান কি না।"

"অ্যাঁ! এ আবার হয় নাকি? এই তো মরলাম, আবার কী করে ওখানে যাব?"

"এখন টেকনোলজির যুগ মশাই। হাইফাই ব্যাপারস্যাপার এখন নরকে। যান-যান, আর দেরি করবেন না। তবে মনে রাখবেন, টোকেন কিন্তু পাঁচ ঘণ্টার জন্য ভ্যালিড। তার মধ্যে ফিরে না এলে কিন্তু এখানে নো এন্ট্রি।"

বিশ্বম্ভরবাবু আর উপায় না দেখে পা বাড়ালেন এক্সচেঞ্জ কাউন্টারের দিকে, টোকেনও নিলেন। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল যে যিনি তাঁর এতটা হেল্প করলেন তাঁর নামটাও জানা হল না। সেটাও বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। 'ধুত্তোর!' বলে নিজেই নিজের মাথায় একটা চাপড় মেরে বেরিয়ে পড়লেন মর্ত্যের উদ্দেশে।

মর্ত্যে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল। এই মধ্যরাতে কোনও দোকানও খোলা নেই যে চশমা কিনবেন। চশমাটা কোথায় হারিয়েছেন সেটাও মনে পড়ছে না। বিকেলে ঘরে যাওয়ার আগে একবার নদীর ধারে গিয়েছিলেন বটে। সেখানেই একবার ঢুঁ মারবেন বলে স্থির করলেন বিশ্বম্ভরবাবু।

নদীর ধার মধ্যরাতে বেশ শুনশান, ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। গুটিকতক ভিখারি আর কুকুর ছাড়া এ তল্লাটে আর কেউ নেই। তাই তিনি নিশ্চিন্তে চশমাখানা খুঁজতে পারবেন, এই ভেবে মহানন্দে নেমে পড়লেন ঘাটের নীচের সিঁড়িটার দিকে। নদীর পাড় বরাবর তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু করলেন। মোবাইলের টর্চ জ্বেলে চলল চিরুনি তল্লাশি।

প্রায় ঘণ্টা'দুয়েক হয়ে গিয়েছে। নদীর পাড় বরাবর বেশ খানিকটা চলে এসেছেন, সেটাও খেয়াল করেননি বিশ্বম্ভরবাবু। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের মহামূল্যবান জিনিসটা পেলেন না। এত খোঁজাখুঁজি তাঁর বৃথা। কী আর করা যাবে! হতাশ হয়ে নদীর শান্ত জলে পা ডুবিয়ে বসে পড়লেন নদীর পাড়ে। ম্লান চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন এখন কী করে তাঁর জীবন চলবে, গিন্নির কী হবে ইত্যাদি-ইত্যাদি। এমন সময় হঠাৎ তাঁর পায়ে কী যেন একটা ঠেকল। নদীর জলে কী যেন একটা ভেসে এসেছে তাঁর পায়ের কাছে। তড়িঘড়ি হাতে তুলে নিলেন। ভাল করে দেখতেই তাঁর ঠোঁটদুটো বিস্তৃত হয়ে গেল আর দু'হাত তুলে উল্লাস করতে-করতে নদীর পারে দাঁড়িয়ে তিনি চেঁচাতে থাকলেন, "পেয়েছি, আমি চশমা পেয়ে গিয়েছি..."

এতটা আনন্দ তিনি বেঁচে থাকতে কোনওদিন পেয়েছেন কি না, তার ঠিক নেই।

দেখতে-দেখতে প্রায় চারঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। বুকপকেটে চশমা আর একহাতে নরকের টোকেন নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। নদীর শান্ত জলে চাঁদের নরম আলো বেশ লাগছিল বিশ্বম্ভরবাবুর।

এই নরম আলোর রাত ছেড়ে তাঁর যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। এই ভেবে পকেটে হাত ঢোকাতেই মালুম হল, টোকেনটা নেই!

'আরে! গেল কোথায়? এই তো ছিল!'

এখন তাঁর মাথায় যে দু'গাছা চুল আছে, সেটাও ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে!

'এটাও হারালাম শেষ পর্যন্ত!'

বিশ্বম্ভরবাবুমাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন নরক আর মর্ত্যের মাঝরাস্তায়।

মনে পড়ে গেল তাঁর গিন্নির কথাটা, "তুমি মরলেও এ হারানোর রোগ তোমার যাবে না।"

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

মজার ঝাঁপি

বাৎসরিক ক্রীড়া উৎসব

শীতকালের সঙ্গে খেলাধুলোর একটা চিরকালের সম্পর্ক আছে। নরম রোদে শরীর ঘামানোর মজাটুকু লুটেপুটে নিতেই চলে পাড়ায়-পাড়ায় স্কুলে-স্কুলে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল) সম্প্রতি তাদের ক্রীড়া উৎসব উদযাপন করল সমারোহে। জগদ্দলের বিখ্যাত কে ডি মল্লিকের বিশাল বাগানবাড়িতে প্রতি বছর এই স্কুলের স্পোর্টস হয়। শুরু হয়েছিল জাতীয় সঙ্গীত, প্রধান শিক্ষিকার ভাষণের মধ্যে দিয়ে। অনেক রকম ইভেন্টের মধ্যে চামচ-গুলি, বস্তাদৌড়, ড্রেস-আপ রেসের সঙ্গে চিরচেনা একশো মিটার ফ্ল্যাট রেস, বল ছুড়ে সীমানা পারের মতো খেলাও ছিল সেদিন তালিকায়। অনুষ্ঠানের অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজ। মজার ব্যাপার, শুধু খুদেরাই আহ্লাদে মাতেনি, তাদের আনন্দটুকুকে আরও পূর্ণ করার জন্য সঙ্গে ছিল অভিভাবকদের প্রতিযোগিতাও। পুরস্কার বিতরণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলেও শুরু হয়ে গেল পরের বছরের প্রতীক্ষা।

উদ্ভাবনের আলো

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজ়িয়াম আয়োজন করেছিল ইনোভেশন ফেস্টিভ্যাল ২০২০। একদিনের এই অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল সায়েন্স মডেল প্রতিযোগিতা। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ১০৭জন ছাত্রছাত্রীরা তাদের ৫১টি টিম নিয়ে দারুণ আগ্রহোদ্দীপত বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শন করল। তবে শুধু স্কুলের পড়ুয়ারাই নয়, তিনটি উপবিভাগের মধ্যে ছিল আই টি আই এবং কলেজের ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রিধারী ছাত্রছাত্রীরাও। অল্প বয়স থেকেই যাতে ভবিষ্যতের নাগরিকরা উদ্ভাবনে আগ্রহী হতে পারে এবং হাতে-কলমে বইয়ের পাতায় পড়া অধীত বিষয়টিকে যাচাই করে নিতে পারে, সবচেয়ে বড়কথা তারা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে পারে, সেই উদ্দশ্যেই রূপ পেল কলকাতার বি আই টি এম-এর এই প্রয়াস।

অনেকের ছবি আঁকতে ভাল লাগে। অনেকের ভাল লাগে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখতে। তোমাদের যা ইচ্ছে তা লিখে এবং এঁকে পাঠাও। ভাল হলে এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে।

আমার ছবি

অভীপ্সা সাহু
সপ্তম শ্রেণি, বর্ধমান মডেল স্কুল, বর্ধমান।

অগ্নিভ ঘোষ
দ্বিতীয় শ্রেণি, বর্ধমান মডেল স্কুল, বর্ধমান।

আমার ছবি

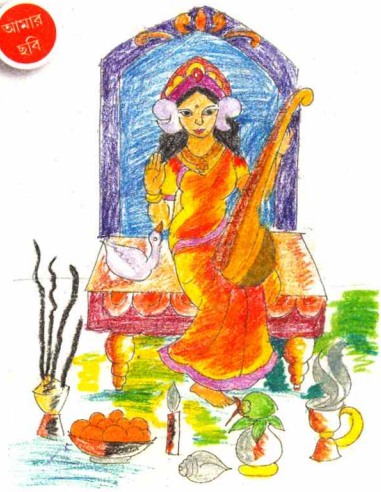

আমার লেখা

দূরের পাখি

ওই যে দূরের আকাশটাতে যখন পাখি ওড়ে,
তখন আমার মনটা যেন কেমন-কেমন করে।
মনে যে হয় যাচ্ছে, ওরা আপনজনের কাছে,
সেই যেখানে মিষ্টি ময়ূর পেখম তুলে নাচে।
সেই যেখানে দুষ্টু টিয়ার মিষ্টি নকল করা,
সব কিছুই আনন্দ আর ভালবাসায় ভরা।
যেই না ডাকি, "এই পাখিটা একবারটি আয়",
পাখি তখন মিষ্টি চোখে আমার দিকে চায়।
তারপরেতে আমায় দেখেই যায় সুদূরে উড়ে,
বলতে পার আমায় দেখেই যায় সুদূরে উড়ে,
বলতে পার আমায় তুমি, যায় সে কত দূরে।

অভীপ্সিতা ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি, মেম্যারি রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান।

তোমরা যারা দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ো, তারা এই পাতার জন্য লেখা এবং ছবি পাঠাও।

ভূতের ডায়েরি

সুজিত বসাক

২৬ জুন, শনিবার

আমার নাম রামানন্দ গোস্বামী। মানে জ্যান্ত অবস্থায় ছিল আর কী। গত শনিবার ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে জঘন্যভাবে মৃত্যু হয়েছে আমার।

আপনারা এটাকে মৃত্যু না বলে অপমৃত্যুই

বলবেন। যাই হোক, মরার পরেও যে আসলে শান্তি নেই, সেটা এখানে এসে আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি।

এখানে এসে তো মাথায় হাত! সাতদিন হয়ে গেল, এখনও রেজিস্ট্রেশনই করে উঠতে পারলাম না। আবার ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবেন, তারও উপায় নেই। ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়লে আপনাকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আজ কিছুটা মরিয়াভাবেই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। টানা তিনঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ডাক পড়ল আমার। নামধাম লিখে নেওয়ার পর আমাকে 'ব্রহ্মদত্যি' উপাধি দিয়ে অন্য একটা টেবিলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যে ভূত মহোদয় খাতাপত্রের কাজকর্ম করছিলেন, দন্ত বিকশিত করে প্রথমেই এমন একটা হাসি দিলেন যে, আমি ভয় পেয়ে দু'হাত পিছিয়ে এলাম। এটা হাসি! উনি কিন্তু তাড়াতাড়ি করে ওঁর সরু টিংটিঙে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে বললেন, "নতুন-নতুন ভূত হয়েছেন তো, তাই মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে। ক'টা দিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাপ রে, কী বিচ্ছিরি চেহারা ভূতটার! ওঁর মুখটা গম্ভীর হল। মনের কথা বুঝে ফেললেন নাকি? সোজাসুজি বললেন, "এখানে কোনও আয়না রাখা হয় না। মানুষের আয়নায় আমাদের ছবি আসে না। একে অপরের চোখেই নিজেকে দেখার রীতি এখানে। ক'টা দিন কাটুক। নিজেকে একটু ভূত ভাবতে শিখুন। নিজের চেহারা সম্বন্ধেও একটা আন্দাজ হয়ে যাবে আপনার। এখনও মানুষ-মানুষ রেশটা রয়ে গিয়েছে কিনা! এটা আপনার দোষ নয়।"

ওঁর কথার মাথামুন্ডু সেভাবে কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু মনে হল, কোনও গভীর জ্ঞানের কথাই আমাকে বোঝালেন। লাইনের পিছন দিকের ভূতদের ঠেলাঠেলি আর চিৎকার-চেঁচামেচিতে বেশি প্রশ্ন করার উপায়ও ছিল না।

একটু পরেই বুঝে গেলাম আমার সামনের রেজিস্ট্রেশন আধিকারিক ভূত মহোদয় অত্যন্ত সজ্জন ভূত। আমার প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল হয়ে বললেন, "মানুষ হিসেবে আপনার পারফরম্যান্স খাসা। সব মিলিয়ে আপনাকে একটু ফেভার করাই যায়। ভয় নেই, এখানে ফেভার পেতে গেলে কোনও ঘুষটুস লাগে না। ওসব এখানে স্ট্রিক্টলি নিষিদ্ধ। একটা নির্জন এলাকা, যেখানে মানুষের আনাগোনা কম, এমন জায়গায় আপনার থাকার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। মনে হয় আপনি তাতে খুশিই হবেন।"

আমি বললাম, "একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না। আপনার কথার মধ্যে প্রচুর ইংরেজি শব্দ এসে যাচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই খুব শিক্ষিত মানুষ ছিলেন?"

আবার দন্ত বিকশিত হল ওঁর। তবে এবার অতটা খারাপ লাগল না। বললেন, "ঠিকই ধরেছেন। আমি একটা কলেজে ইংরেজি পড়াতাম। বেশ সুখ্যাতি ছিল। সেই সঙ্গে প্রচুর টাকাপয়সাও জমেছিল। কিন্তু সেটাই কাল হল। আমার নিজেরই ছোটভাই লোভে পড়ে ষড়যন্ত্র করে দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আমাকে মেরে ফেলল। সবাই ভাবল আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছি। সুন্দর করে কেসটাকে সাজিয়ে ও আমার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করে এখন বহাল তবিয়তে আছে।

"ইচ্ছে করলে আমি রিভেঞ্জ নিতে পারতাম। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, ওরকম ভাইকে এখানে আনার কোনও মানে হয় না। এখানে বেশ ভাল আছি আমি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "চাকরিটা পেলেন কীভাবে?"

উনি বললেন, "এখানেও নানা রকম পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। ওপারের ডিগ্রিগুলোই এখানে কাজে লেগে যায়। কিছুদিন থাকুন, ধীরে-ধীরে সব জেনে যাবেন।

"সেরকম মনে হলে আপনিও অ্যাপ্লাই করতে পারেন। বাংলায় এম এ করেছেন, যথেষ্ট ভাল ডিগ্রিই রয়েছে আপনার। আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন,আমি আপনাকে হেল্প করব।"

আমি বললাম, "যোগাযোগ রাখব কীভাবে? ফোনটোন তো কিছুই নেই।"

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন উনি, "এখানে ফোনটোন লাগে না যোগাযোগ করতে। প্রত্যেক ভূতের কাছে একটা করে চার সংখ্যার কোড নম্বর থাকে। সেটাই তার পরিচয়, আবার সেটাই তার ফোনও বলতে পারেন। আপনাকেও দিয়ে দেওয়া হবে রেজিস্ট্রেশনের পরেই। আমার কোড নম্বরটা মনে-মনে একবার আওড়ালেই আমার সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে পারবেন। একই পদ্ধতিতে আমিও আপনার সঙ্গে কনটাক্ট করতে পারব। কষ্ট করে নম্বরটা শুধু মনে রাখা। অবশ্য লিখেও রাখতে পারেন।"

৩০ জুন, বুধবার

রেজিস্ট্রেশনের ভদ্র ভূতমহোদয় তাঁর কথা রেখেছেন। আমার থাকার জন্য যে জায়গাটা নির্বাচন করেছেন, সেটা সত্যি চমৎকার। শহর থেকে দূরে, জঙ্গলঘেরা একটা পোড়োবাড়ি। সমস্ত ব্যবস্থাই অতি উত্তম। সবচেয়ে বড় কথা, এই চত্বরে মানুষের আনাগোনা প্রায় নেই বললেই চলে। একসময় এটা প্রাচীন এক জমিদারবাড়ি ছিল। এখন ধ্বংসাবশেষ। জমিদারগিন্নি বহুকাল ভূত হয়ে বাড়িটা আগলে রেখেছিলেন। কাউকেই আসতে দিতেন না ধারেকাছে। কোনওভাবে ওঁর আত্মার মুক্তির পর আপাতত এটা ফাঁকাই পড়ে ছিল। রেজিস্ট্রেশন আধিকারিক বাসস্থান অ্যালট করার

আগে আমাকে বাড়িটার পুরো ইতিহাস শুনিয়েছিলেন। তারপরই বলেছিলেন, "এসব বনেদি জায়গা তো সবাইকে অ্যালট করা যায় না। ওই জমিদার বংশের লোকেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই আপনাকেই দিলাম। কোনও সমস্যা হলে জানাবেন। বিকল্প ব্যবস্থাও আমার কাছে আছে।"

প্রথম দর্শনেই আমার পছন্দ হয়ে গেল। বিকল্পের কথা একবারও মাথাতেই

এল না। শান্তিতে বসবাস করার যে অভিপ্রায় ছিল, সেটা এখানে পাব বলেই মনে হল।

মনুষ্যজীবন আমার মোটেও শান্তির ছিল না। বত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলেও সেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। বাবা মারা যাওয়ার পর প্রাইভেট টিউশন, বিমার দালালি, মশলাপাতির সাপ্লাই, অনেক কিছু করে কোনওরকমে সংসারটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আবার এর মধ্যে হঠাৎ করে মায়ের ক্যানসার ধরা পড়াতে অথৈ জলে পড়ে গিয়েছিলাম। ভেবে রেখেছিলাম জমানো যা কিছু আছে, সেটা দিয়ে আগে ছোট বোনটার বিয়ে দেব। কিন্তু মায়ের অসুখ সব হিসেব গোলমাল করে দিল। এসব চিন্তায় সবসময় মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। ওইরকমই এক অন্যমনস্ক মুহূর্তে ট্রাকটা চাপা দিয়ে গেল।

দোতলার ব্যালকনির ধারের একটা ঘর খুব মনে ধরল আমার। স্যাঁতসেঁতে মেঝে, শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। পাশের বিশাল গাছটার ঘন ছায়া দিনের বেলাতেই রাতের আঁধার নামিয়ে দিয়েছে। বাড়ির পিছন দিকে একটা সরু নদী আছে। নদীর পার বরাবর নিবিড় বাঁশঝাড়। সব মিলিয়ে আদর্শ ভৌতিক পরিবেশ বলতে যেটা বোঝায়, সেটা এখানে আছে। একটা জিনিস লক্ষ করছি, ভূত হওয়ার পর আমার পছন্দগুলোও ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। যাই হোক, সবকিছু গোছগাছ করে নিজের আস্তানাটা মনের মতো করে সাজিয়ে নিতে পুরো একটা দিন চলে গেল।

দিনগুলো বেশ মজাসেই কাটতে লাগল। খাইদাই, ঘুমাই। অন্য কোনও কাজ নেই। কিন্তু কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হল একঘেয়েমি। সময় আর কাটতে চায় না কিছুতেই। এখানে আমার কোনও বন্ধু নেই। মাঝে-মাঝে দু'-চারটে আবোলতাবোল ফোর ডিজিট মনে এনে নতুন বন্ধু পাতানোর চেষ্টা করি। কিন্তু কপাল মন্দ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেগে যায় এমন সব ভূতদের নম্বরে, যাদের কথাবার্তাই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি না! কেউ-কেউ তো রীতিমতো গালাগালি দিতে শুরু করে। রেজিস্ট্রেশন আধিকারিককে একদিন আমার সমস্যার কথা খুলে বললাম। সব শুনে উনি গম্ভীর মুখে বললেন, "একটা বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করা হয়নি। সব ভূত কিন্তু ভাল হয় না। এরকম আর করবেন না। কোনওভাবে যদি আপনি শয়তানগুলোর পাল্লায় পড়ে যান, তা হলে কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ করে ছাড়বে।

নদীর পার বরাবর নিবিড় বাঁশঝাড়। সব মিলিয়ে আদর্শ ভৌতিক পরিবেশ বলতে যেটা বোঝায়, সেটা এখানে আছে। একটা জিনিস লক্ষ করছি, ভূত হওয়ার পর আমার পছন্দগুলোও ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। যাই হোক, সব কিছু গোছগাছ করে নিজের আস্তানাটা মনের মতো করে সাজিয়ে নিতে পুরো একটা দিন চলে গেল।

"বুঝতে পারছি আপনার একটা কাজ ও ভাল সোসাইটির খুব প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে হুড়মুড়িয়ে ভূতের সংখ্যা বাড়ছে... বুঝতেই পারছেন... সবাইকে কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পাল্লা দিয়ে বেকার ভূতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।"

৫ জুলাই, সোমবার

একেই বোধ হয় বলে, গোদের উপর বিষফোঁড়া। একে কিছু কাজকর্ম জুটছে না বলে মনে-মনে অশান্তিতে ভুগছি, এর মধ্যে আর এক জীবন্ত অশান্তি এসে হাজির আমার বাড়িতে! প্রথমে ভাবলাম মহাশয় ঘুরতেটুরতে এসেছেন, সন্ধে হলেই ফিরে যাবেন। পুরনো জমিদারবাড়ি নিয়ে অনেকের অনেক রকম কৌতূহল থাকে। আবার অনেকে নানা রকম গবেষণাও করে। কিন্তু ও মা! এ কী কাণ্ড! বিকেলের দিকে দেখি দুটো তাগড়া ছেলে বেডিংপত্তরসমেত ওঁকে পৌঁছে দিয়েই সুরুত করে কেটে পড়ল। কিন্তু ওই লোকটার দেখলাম কোনও ভয়-ভীতি নেই। নীচতলার মোটামুটি বাসযোগ্য একটা ঘর সাফাই করে দিব্যি রাত্রিবাসের উপযুক্ত করে তুললেন। লোকটা রাতে এখানেই থাকবে নাকি?

ব্যাপারটা তক্ষুনি রেজিস্ট্রেশন আধিকারিককে জানালাম। কথা শুনে বুঝলাম উনি আগেই জেনে গিয়েছেন ব্যাপারটা। শান্ত গলায় বললেন, "আমাদের মোবাইল পেট্রলিং অফিসারের মুখে শুনেছি। একটু আগেই উনি জানালেন, লোকটার নাম ত্রিভুবন মুখোপাধ্যায়। একটু খ্যাপাটে ধরনের মানুষ। তবে লেখেন ভাল এবং লেখক হিসেবে বেশ নামডাক আছে, বিশেষ করে ভূতের গল্প লেখায়। পুজোসংখ্যার জন্য তিনটে ভৌতিক উপন্যাস লেখার ফরমায়েশ পেয়েছেন। কিন্তু বাড়িতে লেখার অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছিলেন না বলে ঘুরতে-ঘুরতে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। মনে হয় জায়গাটা মনে ধরেছে। মনে হয় না, উনি আপনাকে খুব বেশি ডিস্টার্ব করবেন। যদি বেশি জ্বালায়, একটু ভয়টয় দেখিয়ে দেবেন, কাল সকালেই পালিয়ে যাবে। ভূতের সামনে আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ টিকতে পেরেছে বলে শোনা যায়নি।"

একজন মানুষের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতে অস্বস্তি হলেও আপাতত মানিয়ে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। অন্তত আজকের রাতটা এভাবেই কাটাতে হবে বুঝে গেলাম। একটু রাত হতেই লোকটা একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে খাতা-কলম বের করে খসখস করে লেখা শুরু করলেন। পাশে ছড়ানো-ছেটানো বেশ কিছু মোটা-পাতলা নানা আকারের বই। আমি ভয় দেখানোর জন্যে কৃত্রিম একটা হাওয়া সৃষ্টি করে ওঁর দিকে চালিয়ে দিলাম। প্রথমে একটু চমকে উঠলেও উনি কিন্তু বিচলিত হলেন না। গম্ভীরভাবে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর দেখি ঠোঁটের কোণে মুচকি একটা হাসি ফুটে উঠল। যেন হাওয়ার রহস্যটা উনি বুঝে গিয়েছেন। নিজেকে কেমন জানি বোকা-বোকা লাগল। সেই সঙ্গে

একটা জেদও চেপে বসল। এই অবজ্ঞার যোগ্য জবাব দিতে হবে।

কিন্তু দ্বিতীয়বার কিছু করতে যাওয়ার আগেই উনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "আরে মশাই, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভূতের গল্প লিখে আসছি, ভূত সম্পর্কে একটু হলেও ধারণা তো হয়েছে, নাকি? আপনার অস্তিত্ব আমি টের পেয়ে গিয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, আপনি তেমন ভয়ংকর ধরনের ভূত নন। হলে বহু আগেই নিজের স্বরূপ দেখিয়ে দিতেন। এরকম ফুঁ...ফা... করতেন না।"

আমি কেমন ভ্যাবলা হয়ে গেলাম।

৬ জুলাই, মঙ্গলবার

রেজিস্ট্রেশন আধিকারিককে জানাতেই উনি বললেন, "ভদ্রলোক কি খুব জ্বালাচ্ছেন আপনাকে? সেরকম বুঝলে বলুন। দুটো বিচ্ছু ভূতকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, একটু টাইট দিয়ে আসবে। না-না, মানুষ এসে সব জায়গাতেই দাদাগিরি করবে, এটা তো ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। আপনি কী বলেন?"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "না-না, সেসবের কোনও দরকার নেই। ওঁর সঙ্গে আমার সরাসরি কথা হয়েছে। ভদ্রলোক এমনিতে খুব ভাল মানুষ। সত্যি কথা বলতে, উনি আমাকে একঘেয়েমি কাটানোর খুব সুন্দর একটা পরামর্শ দিয়েছেন।"

রেজিস্ট্রেশন আধিকারিক অবাক হয়ে বললেন, "ঠিক বুঝলাম না। একটু ডিটেলে বলুন প্লিজ়।"

আমি বললাম, "সব বলব। তার আগে আপনি আমাকে কয়েকটা ইনফরমেশন দিন।"

উনি বললেন, "কী ইনফরমেশন?"

আমি জানতে চাইলাম, "আপনাদের এখানে লেখালিখির চাহিদা কেমন? পত্রপত্রিকা, বই, এসব চলে?"

উনি হেসে বললেন, "বেশ ভাল। অসংখ্য পত্রপত্রিকা বের হয়। ভূত বার্তা, ভূতের দুনিয়া, ভূতের সভা, আরও অনেক আছে। হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি, সব ভাষাতেই বের হয়। প্রকাশনা সংস্থাও আছে প্রচুর। কিন্তু এসব জেনে আপনি কী করবেন?"

এবার আমি মুচকি হেসে বললাম, "সেদিন আপনি আমার বায়োডেটা চেক করেছিলেন। সেখানে একটা স্পেশ্যাল ব্যাপার নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিল। আপনি আন্ডারলাইনও করেছিলেন লাল কালি দিয়ে... কী? মনে পড়ছে?"

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন, "ইয়েস! ইয়েস! পরে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। আবার মনে পড়ে গেল। আপনি মরার আগে পর্যন্ত নিয়মিত লেখালিখি করতেন। বড়-বড় পত্রিকায় সেসব লেখা ছাপাও হত। আপনি এখানে ওটাকেই প্রোফেশন হিসেবে নিতে পারেন। আমি যথাসাধ্য হেল্প করব। এখানে মানুষ নিয়ে লেখার খুব ডিমান্ড আছে। মানুষরা যেমন তাদের পত্রপত্রিকায় স্পেশ্যাল ভূত সংখ্যা বের করে, এখানে তেমনই স্পেশ্যাল মানুষ সংখ্যা বের হয়। ওদের ভূতের গল্পের মতোই এখানে মানুষের গল্প দারুণ জনপ্রিয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ নিয়ে লেখার লেখকের সংখ্যা খুব কম। আপনি যদি ভাল লিখতে পারেন, তা হলে আর দেখতে হবে না! রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন।"

আমি বললাম, "ত্রিভুবনবাবু সেই পরামর্শই দিয়েছেন। আমি মানুষের গল্প লিখব। এ ব্যাপারে উনি আমাকে সাহায্য করবেন। আবার ওঁর ভূত নিয়ে লেখার বিষয়ে আমি সাহায্য করব। আমরা একে অপরকে নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে লেখালিখি চালিয়ে যাব। আপনি কী বলেন ?"

বেশ উত্তেজিতভাবে উনি বললেন, "গ্রেট! ব্যাপারটা বেশ ইউনিক হবে বলেই মনে হয়। তা ছাড়া এতে দ্বিপাক্ষিক রিলেশনটাও স্ট্রং হবে বলেই আমার ধারণা। আপনি আর দেরি করবেন না। কাল থেকেই কাজ শুরু করে দিন।"

ওঁর কথা শুনে মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। সত্যি কথা বলতে, এতটা গভীরের ভাবনা আমার মাথায় একবারের জন্যও আসেনি।

২০ ডিসেম্বর, সোমবার

আজ আমার খুব আনন্দের দিন। ভূতবার্তা পত্রিকার বিশেষ 'মানুষ সংখ্যা'য় আমার উপন্যাস 'ছোট বোন' বেরিয়েছে। লেখাটা পড়ে অসংখ্য ভূত পাঠক-পাঠিকা আমাকে অভিনন্দনবার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সম্পাদক মোটা অঙ্কের একটা চেক পাঠিয়েছেন। ভূত হওয়ার পরে আমার প্রথম রোজগার। টাকাটা হাতে পাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ বসে-বসে কেঁদেছি। কারণ, যাঁদের নিয়ে গল্পটা লিখেছি, এই টাকা তাদের কোনও কাজেই আসবে না। এই টাকা দিয়ে মায়ের চিকিৎসা করাতে পারব না। বোনের বিয়েও দিতে পারব না। কারণ, এই টাকা যে ওখানে চলবে না!

আমার কান্নাটা বোধ হয় বিধাতা পুরুষ শুনতে পেয়েছিলেন। ত্রিভুবনবাবু একদিন এসে বললেন, "তুমি যে আইডিয়া দিয়েছিলে, সেসব নিয়ে লিখে আমি তো তারকা হয়ে গেলাম ভায়া! যে তিনটি উপন্যাস লিখেছিলাম, তার মধ্যে দু'- দু'খানা মুম্বইয়ের এক ফিল্ম কোম্পানি কিনে নিল। ওরা নাকি ফিল্ম বানাবে। দ্যাখো কাণ্ড! যে টাকা ওরা দিল, সেটা দেখে আমার তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মুশকিল হল এত টাকা দিয়ে আমি করব কী? বিয়েথা করিনি, তিনকুলে কোনও আত্মীয়স্বজন আছে বলেও জানি না। হয়তো ছিল, কিন্তু কেউ যোগাযোগ রাখেনি। তাই একটা কাজ করেছি। টাকাগুলোর একটা সদ্‌গতি তো হওয়া দরকার।"

আমি বললাম, "কী কাজ?"

উনি বললেন, "তোমার মাকে মুম্বইয়ের এক ক্যানসার হসপিটালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলাম। দেখি, এবার তোমার ছোট বোনটার বিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারি কিনা। এসবের জন্যেই তো তুমি সেদিন বসে-বসে কাঁদছিলে? আরে ভায়া, তোমার টাকা কাজে না এলেও আমার টাকা তো এখানে কাজে আসবে। আর এসব করে আমি তোমাকে কোনও দয়া দেখাচ্ছি না। আমি যে টাকা পেয়েছি তাতে তোমারও অধিকার আছে।"

আবার আমি কেমন ভ্যাবলা হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে আরও একবার বোকা বানিয়ে ছাড়ল!

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

খুদে প্রতিভা

এখন তো পাড়ায়-স্কুলে স্পোর্টসের মরশুম। এমন একটা কাল্পনিক স্পোর্টসের কথা বলো তো, যার কথা কেউ শোনেনি আর যেটা চালু হলে তুমি ভীষণ খুশি হও। লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

পৃথিবীটা যখন সবুজে ভরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পা রেখেছি ২০২০-তে, তখন তো কথা রাখতেই হয়। তাই এবারে আমি স্কুলে এমন এক নতুন ধরনের স্পোর্টস চালু করতে চলেছি, যার মাধ্যমে কেবল বাচ্চাদের নয়, হাসি ফুটবে পৃথিবী ও গাছপালার মুখেও। এই স্পোর্টসে তিন ধরনের খেলা থাকবে।

১ম- ফ্ল্যাগ রেস- বাচ্চারা বাঁশির আওয়াজে দৌড় শুরু করবে ও ট্র্যাকের মাঝখানে থাকা সবুজ পতাকাটি হাতে নিয়েই আবার ছুটবে এবং লাল দড়ি পার হবে। পতাকায় লেখা থাকবে, 'সবুজ বিনাশ করে বুঝি পাচ্ছ অনেক সুখ/ নিজের হাতেই ডেকে আনছ নিজের অসুখ।'

২য়- ম্যাঙ্গো রেস- বাচ্চারা ডাকওয়াক করতে-করতে ট্র্যাকের মাঝখানে পৌঁছবে ও ঝুড়িতে রাখা আম তুলে খেয়ে আঁটিটা হাতে নিয়ে লাল দড়ি পেরবে। এতে শেষ না। মাঠের চারপাশে প্রত্যেককে নিজের-নিজের বীজ পুঁততে হবে ও নিয়মিত যত্ন করতে হবে।

৩য়- ট্রি রেস- এই রেসে বাচ্চারা মাঙ্কি জাম্পে ট্র্যাকের মাঝখানে পৌঁছবে ও রেখে দেওয়া চারাগাছটি হাতে নিয়ে ছুটবে, তারপর আরও কিছুটা দৌড়ে রেখে দেওয়া টবে গাছটি সযত্নে পুঁতে দিয়ে এক দৌড়ে লাল দড়ি পেরবে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়কে পুরস্কৃত করা হবে এবং বাকি প্রতিযোগীদের দেওয়া হবে একটি করে ফল ও চারাগাছ। যারা স্পোর্টসে যোগদান করেনি, তারাও পুরস্কারস্বরূপ গাছের তরফ থেকে পাবে বিশুদ্ধ পরিবেশ ও অক্সিজেন।

তানিস্কা পাত্র
ষষ্ঠ শ্রেণি, পাঠভবন, ডানকুনি, হুগলি।

দ্বিতীয়

কিছুদিন আগেই আমাদের বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ছিল। আমি প্রতিবারের মতো এবারও পিছন দিক থেকে ফার্স্ট হয়েছি। আমি মাটির উপর ছোটায় তো লাস্ট হই, কিন্তু ভাবলাম যে আকাশে ওড়ার স্পোর্টসে আমার রোগা ও হালকা চেহারার জন্য হয়তো জিততে পারব। সেই খেলায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মাথায় হেলিকপ্টারের পাখার মতো একটা পাখা ফিট করা থাকবে। সকলের হাতে থাকবে রিমোট। প্রথমে খেলা শুরু হওয়ার আগে সবাই রিমোটের সাহায্যে উপরে উঠবে। খেলা শুরুর বাঁশি বাজতেই সবাই রিমোটে অ্যাক্সিলেটর বোতাম টিপে এগিয়ে যাবে বা ব্রেক বোতাম টিপে অন্যদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি আটকাবে। এমনিভাবে এগিয়ে যেতে-যেতে মাটিতে থাকা ফিনিশিং লাইনের উপর এসে রিমোটে ল্যান্ড বোতাম টিপে মাটিতে নেমে এসে ফিনিশিং লাইনে যে সকলের আগে হাত রাখবে, সে-ই জিতবে। এই নতুন খেলার নাম হবে উড়ুক্কু দৌড়। আশা করি এই খেলায় হয়তো আমার কপাল খুলবে আর গলায় মেডেল ঝুলবে।

কথামৃত রায়
সপ্তম শ্রেণি, দ্য লেভেলফিল্ড স্কুল, সিউড়ি, বীরভূম।

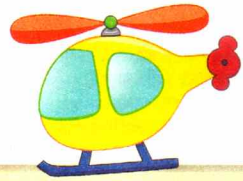

তৃতীয়

এখন শীতকাল। আর শীতকাল মানেই পাড়ার মাঠে, স্কুলে স্পোর্টসের মরশুম। তবে স্পোর্টসের বিষয়গুলো প্রতিবারই যেন প্রায় একই রকম থাকে। কিন্তু প্রতিবার স্পোর্টসের শেষে আমার একটা নতুন প্রতিযোগিতার কথা মনে আসে। সেটা হল দৌড়ে ডাস্টবিনে প্লাস্টিক, ঠোঙা, শালপাতার প্যাকেট ইত্যাদি ফেলা। অর্থাৎ দর্শকরা খেলা দেখতে এসে মাঠের চারপাশে যে-সমস্ত আবর্জনা ফেলে মাঠকে দূষিত করেছে, সেগুলো পরিষ্কার করার জন্যেই এই খেলা। মাঠটিকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রতি সীমানায় একজন করে প্রতিযোগী দাঁড়াবে। তাদের গ্লাভস পরে দ্রুত নোংরা কুড়িয়ে পাশে থাকা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। যে যত দ্রুত কাজটি শেষ করবে, তার ভিত্তিতেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এতে কোনও বয়সসীমা থাকবে না। সব শেষের এই প্রতিযোগিতায় অনেক আকর্ষক পুরস্কার দেওয়া হবে বিজয়ীদের। এতে একদিকে পুরস্কারের আকর্ষণে সবাই অংশ নিতে চাইবে এবং অন্যদিকে আমাদের প্রতিদিনের খেলার মাঠটিও পরিষ্কার ও আবর্জনামুক্ত থাকবে।

কঙ্কনা মিত্র
অষ্টম শ্রেণি, হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

চতুর্থ

নতুন বছরের শুরুতে খুব শীত পড়েছে। চারদিকে পিকনিক আর স্পোর্টসের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। এর মধ্যে একটি কাল্পনিক স্পোর্টসের ভাবনা আমার মাথায় জুড়ে বসেছে। এই খেলায় স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে কিছু দূরে প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য একটি করে ঘর রাখা থাকবে, সেই ঘরে চারটি খোপ আছে। একটি খোপ তালাবন্ধ। সেই তালাবন্ধ খোপে একটি খাঁচায় একটি প্রজাপতি আছে। খেলা শুরু হলে দৌড়ে সেই ঘরে ঢুকতে হবে। সেখানে একটি চাবি শূন্যে ঝুলছে। লাফ দিয়ে, শুয়ে পড়ে যেভাবেই হোক চাবিটি নিয়ে তালাবন্ধ খোপটি খুঁজে, খুলতে হবে। এর পর খাঁচাটি নিয়ে ফিনিশিং পয়েন্টে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছে খাঁচা খুলে প্রজাপতিকে ছেড়ে দিতে হবে। যে আগে কাজটি শেষ করতে পারবে, সে প্রথম, তারপর দ্বিতীয় এবং তারপর তৃতীয়। আমি জানি, চাবি কখনও শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে না। কিন্তু যদি এই স্পোর্টসটি করা যায় আমি সেখানে অংশ নেবই, তা হলে একটি বন্দি প্রজাপতিকে মুক্তি দিয়ে আমি আনন্দ পাব।

আহেলী দাস
চতুর্থ শ্রেণি, লোরেটো কনভেন্ট, এন্টালি, কলকাতা।

পঞ্চম

এখন চলছে স্পোর্টসের মরশুম। আবার হবে রেস, কী মজাটাই না হবে! তবে আমার মনে এসেছে এক আজব রেসের কথা। মনে করো, আমরা রেসে দৌড়চ্ছি। আমার মনের মতো রেসে থাকবে কয়েটি বিশেষ স্থান, যেটা পার করতে গেলে তোমাকে কয়েকটি অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। সেখানে কয়েকটা জিনিস দেখানো হবে। তার মধ্যে সঠিকটা বাছলে তবেই স্থানটি পার করা যাবে। ভুল বাছলে পারবে না। রেসটায় বিভিন্ন স্থানের উপর দিয়ে যেতে হয়। এই যেমন ধরা য়াক, একটা পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়া যাবে না। পুকুরের উপরে যে ব্রিজ, তার মাঝের কিছুটা অংশ ভাঙা। এহেন অবস্থায় কোনটা বাছবে? হাতুড়ি, কাঠ ও পেরেক, কাঠকাটার মেশিন, এই জাতীয়। সহজ থেকে ক্রমশ কঠিন হতে থাকবে ধাপগুলো। আরও থাকবে, যেমন তিনটের কোন দরজা দিয়ে যাবে? বা কোন পথে যাবে? অবশেষে যে পৌঁছবে, সে জিতবে। এই ধরনের স্পোর্টসে কী মজাটাই না হত! সবাইকে জানাই স্পোর্টসের জন্য অল দ্য বেস্ট। যদি সত্যিই আমার মনের মতো স্পোর্টসটা হত!

নিশাত হাবিবা
সপ্তম শ্রেণি, বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া।

আরও যারা ভাল লিখেছে

দেবমাল্য বণিক
পঞ্চম শ্রেণি, শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, চন্দননগর, হুগলি।

হ্রষিতা পাল
পঞ্চম শ্রেণি, ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা।

অনীক দাস অধিকারী
ষষ্ঠ শ্রেণি, পাঠভবন, কলকাতা।

এবারের প্রতিযোগিতা

সামনেই দোলপূর্ণিমা। দোলের দিন খুব মজা হয় তোমাদের। ওই দিনের কোনও মজার ঘটনা আছে কি, যা তুমি ভাগ করে নিতে চাও সবার সঙ্গে? যারা ক্লাস ৮ থেকে এইটে পড়ো, লিখে পাঠাও ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ো বাংলা আর ইংরেজিতে। লেখার শব্দসংখ্যা ১৫০। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৫ মার্চ সংখ্যায় ছাপব। খামের উপর কোন সংখ্যার খুদে প্রতিভা পাঠাচ্ছ, মনে করে লিখবে। ঠিকানা: 'খুদে প্রতিভা', 'আনন্দমেলা', ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

ক্লেশদায়ী কেশচর্চা

বিপুল মজুমদার

হেডমাস্টার বিভাস আচার্যর ঘরে তিন বর্ষীয়ান শিক্ষকের গোলটেবিল বৈঠক। মাথার উপর বনবন করে ফ্যান ঘুরছে। তার মধ্যেই গুরুগম্ভীর সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অঙ্কের শিক্ষক স্বপনবাবুর কপালে দেখা দিল বিন্দু-বিন্দু ঘাম। বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর বিভাসবাবুকে তিনি বললেন, "কেসটা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে স্যার। আমি, অরুণবাবু আর আপনি তিনজনেই তো ভালরকম বুঝিয়েছি ওদের। কিন্তু আখেরে কী দাঁড়াল? একগাল মাছি! সমস্যা হল, এই ব্যাপারে অরুণবাবুর করা গল্পটাকে ওরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। বলছে, স্যারেরা এককালে যা করেছে, আমরাও এখন তাই করছি। সুতরাং কেশচর্চা আমাদের চলছে, চলবে।"

আলোচনায় তাঁর নাম ওঠায় হা-হা করে উঠলেন বাংলার শিক্ষক অরুণবাবু, "আমার কথার অপব্যাখ্যা করেছে ওরা। পড়ানোর সময় কী এক প্রসঙ্গে যেন অনুকরণের কথাটা উঠেছিল। বলেছিলাম, 'স্কুল লাইফে আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকেই দেখেছি সিনেমা আর্টিস্টদের চুলের স্টাইল নকল করতে। আমি যে করতাম, সেটা তো বলিনি! এখন ওরা যদি সে কথা ঘুরিয়ে..."

"প্লিজ, পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটবেন না আপনারা," হাত তুলে দু'জনকেই থামিয়ে দিলেন বিভাসবাবু, "পাস্ট ইজ় পাস্ট। এখন কী করলে সমস্যা মিটবে, সেই কথা বলুন।"

হেডস্যারের কথায় নড়েচড়ে বসলেন স্বপনবাবু, "আমি বলি কী স্যার, নাইন-টেনের ছাত্রদের অভিভাবকদের ডেকে একটা মিটিং করুন। অভিভাবকদের বলুন ছেলেদের শাসন করতে। স্কুল হল জীবনের ভিত গড়ার জায়গা। সেখানে চুল নিয়ে যথেচ্ছাচার বরদাস্ত করা যায় না।"

স্বপনবাবুর খোঁচা দেওয়া কথাটা এখনও হজম করতে পারেননি অরুণবাবু। বুকের নীচে এখনও চোরাজ্বলুনি। তাই প্রস্তাবটা সমর্থনযোগ্য হলেও তাতে সায় দিতে চাইলেন না। মুখটাকে তিতকুটে করে বললেন, "ও লাইনে আগেই আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। চেনাজানা বেশ কয়েকজন অভিভাবককে ডেকে বারকয়েক সতর্কও করেছি। শুনে তাঁদের কী প্রতিক্রিয়া জানেন? বলেছেন, ছেলেরা তাঁদের কথা শোনে না। যা করার আমাদের শিক্ষকদেরই করতে হবে। যদি মনে হয় দু'-চার ঘা দিলে লাইনে আসবে, তা হলে আমরা যেন তাই করি।"

"উঁহু, মারধর একদম নয়," ঘাড় নাড়লেন বিভাসবাবু, "ওতে কেস জটিল হয়ে যেতে পারে। যা করবার মাথা ঠান্ডা করেই করতে হবে। তাই আপাতত স্বপনবাবুর প্রস্তাবটাকে নিয়েই এগোনো যাক। দেখি ওতে কোনও সুরাহা হয় কি না।"

অরুণবাবু মানুষটা একটু মারকুটে প্রকৃতির। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ না হওয়ায় গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি, "সুরাহা হবে না, তা আমি হলফ করে বলতে পারি স্যার। বিশেষ করে ওই তিন ধানিলঙ্কা, অশোক, শ্যামল আর কাঞ্চনকে সামলানো তো শিবেরও অসাধ্য! ক'দিন আগেই তো, কাঞ্চনকে চুলের ছাঁট ভদ্রসভ্য করতে বলায় সে ছোকরা আমায় কী বলল জানেন? বলল, 'আমাদের স্কুলের নাম কেশবপুর বয়েজ় স্কুল। নামের মধ্যেই কেশ শব্দটা আছে স্যার। সুতরাং এখানে কেশের প্রদর্শনী তো হবেই!'"

"অ্যাঁ, তাই বলল নাকি!" বিস্ময়ের ধাক্কায় চেয়ারের হাতল থেকে হাতটা পিছলে গেল বিভাসবাবুর।

"শুধু কি কাঞ্চন? অশোক তো আরও এক কাঠি উপর দিয়ে যায় স্যার। সে ছোকরা বেমালুম বলে দিল, 'স্কুলের অনেক স্যারই তো চুলে-গোঁফে কলপ করেন। তাদের বেলায় দোষ নেই, যত দোষ অশোক ঘোষ!'"

বিভাসবাবু চুলে কলপ করেন। স্বপনবাবু গোঁফে। দু'জনেই লজ্জা পেয়ে বিষম খেলেন। প্রসঙ্গ বদলাতে স্বপনবাবু তুরন্ত বলে উঠলেন, "হ্যাঁ স্যার, ক্লাস টেনের ওই তিন অকালপক্বই হল নাটের গুরু। ওরাই বাকিদের মাথাগুলো খেয়েছে! কী সব বিচিত্র নাম। রোনাল্ডো ছাঁট, বিরাট কোহালি ছাঁট, নেমার ছাঁট।"

সহকর্মীর উপর রাগ ভুলে অরুণবাবুও এবার পোঁ ধরলেন, "শুধু কি ছাঁট? রংয়ের ব্যবহারের কথাটাও বলুন না স্বপনবাবু। বিদঘুটে ছাঁটের উপরে মাখনের মতো হালকা রংয়ের প্রলেপ।"

শুনেই হেডস্যারের মুখটা বিষাদে ছেয়ে গেল, "ইস, এত পুরনো ঐতিহ্যশালী একটা স্কুল। সেখানে কিনা এই অপকর্ম! সেদিন সেক্রেটারি মৃদুলবাবু আমাকে একচোট কথা শোনালেন। বললেন, 'এসব কী হচ্ছে হেডমাস্টারমশাই? ছাত্রদের চুলের বাহার দেখে লোকে তো ছিছিক্কার করছে! ওরা লেখাপড়া করতে স্কুলে আসছে নাকি ফ্যাশন শো করতে? আপনি এক্ষুনি এর একটা বিহিত করুন।'"

"আর বিহিত!" হতাশায় কাঁধ ঝাঁকালেন অরুণবাবু, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি! উত্তমমধ্যম না দিলে বদমাশগুলোকে কিছুতেই সিধে করতে পারবেন না স্যার।"

"ভীষণ মারকুটে লোক তো মশাই আপনি!" বিভাসবাবুর চোখে ভ্রুকুটি, "গত বছর নাইনের এক ছেলেকে চড় মেরে কেমন ফেঁসেছিলেন, মনে নেই? আপনার জন্য আমাকেও প্রচুর ভুগতে হয়েছিল। সুতরাং বলপ্রয়োগ নৈব নৈব চ। যা হবে সব শান্তিপূর্ণভাবে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।"

॥ ২ ॥

মঙ্গলবার বলে সেলুনে আজ তেমন ভিড়ভাট্টা নেই। দুপুর একটা বাজতেই তাই নিউ স্টাইল সেলুনের মালিক রাকেশ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার তোড়জোড় শুরু করল। ক্যাশবাক্সের টাকা পকেটে ঢুকিয়ে ফ্যান বন্ধ করতে গিয়ে দেখল সামনেই হেডস্যার দাঁড়িয়ে। মাথায় ছাতা থাকলেও দরদর করে ঘামছেন বিভাসবাবু। রাকেশ হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল। নিচু হয়ে স্যারকে প্রণাম করে বলল, "চুল কাটাবেন স্যার?"

বিভাসবাবু তার প্রাক্তন ছাত্রটির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখের চশমাটাকে ঊর্ধ্বমুখে সামান্য ঠেলে দিয়ে বললেন, "এসব কী হচ্ছে রাকেশ! তোমাদের জন্য স্কুলের মানমর্যাদা কি সব গোল্লায় যাবে?"

স্যারের প্রশ্নে ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রাকেশ, "কী বলছেন... আমি তো কিছুই..."

"না বোঝার তো কিছু নেই!" ছাতা গুটিয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন বিভাসবাবু, "খবর আমার সব নেওয়া হয়ে গিয়েছে রাকেশ। আমাদের এই কেশবপুরে

সেলুনের সংখ্যা হাতে গুনে আটখানা। তার মধ্যে তোমার নিউ স্টাইল সেলুন আর বিশুর মডার্ন সেলুন, এই দুটোই যত নষ্টের গোড়া। ভাইরাসটা বেশি করে তোমরাই ছড়াচ্ছ। নষ্ট করে দিচ্ছ ছাত্রদের মাথাগুলো।"

রাকেশ হতভম্ব। কিছুটা বুঝে, কিছুটা না-বুঝে সে বলে উঠল, "আমি আবার কী করলাম স্যার!"

"বোকা সাজার চেষ্টা কোরো না রাকেশ। কেশবপুরে কিম্ভূত সব ছাঁটের আমদানি কিন্তু তোমরাই প্রথম করেছ। স্কুলে শৃঙ্খলা বলে একটা জিনিস আছে। তোমাদের সেলুনওয়ালাদের কারণে তার

বারোটা বেজে যাচ্ছে। আমার অনুরোধ, শিগগির এসব বন্ধ করো।"

হেডস্যারের আগমনের উদ্দেশ্যটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল রাকেশের কাছে। সে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "কিন্তু স্যার, চুল কাটা তো আমার পেশা। না কাটলে খাব কী?"

"সে তুমি কাটো না, কে বারণ করেছে?" উত্তেজনার আধিক্যে বাইরে পেতে রাখা বেঞ্চটার উপর ধপ করে বসে পড়লেন বিভাসবাবু, "কাঁচির কারিকুরি না দেখিয়ে ভদ্রসভ্য কোনও ছাঁট দাও না! এমন ছাঁট, যা দেখে কেউ আঙুল তুলতে না পারে। বলতে না পারে যে, সেলুনগুলোর দৌলতে ছাত্ররা সব ঝুঁটিওয়ালা মোরগ হয়ে যাচ্ছে।"

বাপের আমলের দোকান রাকেশের। ব্যবসা বাড়ানোর জন্য বছরখানেক হল ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে নতুন করে সাজিয়েছে সেলুনটা। আগাপাশতলা ঝাঁ-চকচকে ব্যবস্থা। সাউন্ড সিস্টেমে গানও বাজে। সেই কারণে ছেলেছোকরাদের ভিড় লেগেই থাকে। ছাত্ররাও ঝাঁক বেঁধে আসে। তা এখন হেডস্যারের কথায় দোটানায় পড়ল সে। একদিকে ব্যবসা বাঁচানোর তাড়না, অন্যদিকে স্কুলের প্রতি দায়বদ্ধতা। শেষটায় কোনও দিশা না পেয়ে সে বলে উঠল, "কিন্তু স্যার, ছাত্রদের আটকানোর দায়িত্ব তো বাবা-মায়েদের। বাড়ির লোকেরা যদি শাসন করে, তা হলে তো অঙ্কুরেই মিটে যায় সমস্যাটা। আপনি ওদের বাবা-মায়েদের বলুন না!"

"সে কি আর বলিনি ভেবেছ!" মুখখানা পাংশু হয়ে উঠল বিভাসবাবুর, "মিটিং ডেকে পাখি পড়ার মতো করে বুঝিয়েছি অভিভাবকদের। কিন্তু তাদের সক্কলের এক রা। সিনেমা-টিভি দেখে, বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে এসব নাকি শিখেছে ছেলেরা। কিছু বলতে গেলেই নাকি মুখ ভার করে থাকে। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়। সুতরাং যা করার, আমাদেরই করতে হবে। বোঝো কাণ্ড!"

স্যারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে অজুহাত খোঁজে রাকেশ, "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমাকে একা বলে কী হবে স্যার? এ তল্লাটে আরও তো অনেক সেলুনওয়ালা আছে। তারা যদি আগের মতোই..."

"সেসব আমার মাথায় আছে রাকেশ। কাউকেই আমি বাদ দেব না। তোমার কাছে প্রথমে এলাম, তার কারণ তুমি আমার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। স্কুলের সুনামের ব্যাপারটা তোমার চেয়ে ভাল কেউ আর বুঝবে না। আমি বলি কী রাকেশ, ছাত্রদের কাকুতি-মিনতিতে এবার থেকে তুমি কান দিয়ো না। বলবে ছাত্রসুলভ ছাঁট হলে আমি আছি, নচেৎ নেই।"

কপালময় জবজবে ঘাম। মুখখানা বিষাদে ভরা। কথাটা বলেই যাওয়ার জন্য বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিভাসবাবু। মানুষটার পানসে মুখের দিকে তাকিয়ে রাকেশ এবার তার শেষ যুক্তি প্রয়োগ করল, "কেশবপুরের বাইরে তো সেলুনের অভাব নেই স্যার। ছাত্ররা সেখানে গিয়ে যদি চুলের ছাঁট দিয়ে আসে, তখন?"

প্রাক্তন ছাত্রের কথায় এবার যারপরনাই বিরক্ত হলেন বিভাসবাবু। ফটাং করে ছাতাটা খুলে বললেন, "যদির কথা নদীতে ফেলো রাকেশ। চেষ্টার বিকল্প কিছু নেই। স্কুলের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। তোমাদের সহযোগিতা পেলে মনে হয় না আমি ব্যর্থ হব।"

॥ ৩ ॥

মন-মেজাজ একদম ভাল নেই বিভাসবাবুর। দু'মাস হয়ে গেল, তবু ছাত্রদের উৎকট কেশচর্চায় পুরোপুরি লাগাম টানতে পারলেন না। ছাত্রদের বোঝানো থেকে শুরু করে অভিভাবকদের সতর্ক করা, সেলুনগুলোয় অভিযান চালানো থেকে শুরু করে পরীক্ষায় নম্বর কাটার ভয় দেখানো, যা কিছু অস্ত্র ছিল সবই প্রয়োগ করেছেন। তবু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এল না। বেশির ভাগ ছেলে শুধরে গেলেও অশোক, কাঞ্চনদের বাগে আনতে ব্যর্থ তিনি।

রোগজীবাণুদের সমূলে বিনষ্ট করা না গেলে তারা আবার ফিরে আসে। তেমনি পালের গোদাগুলোকে ঠিক করতে না পারলে আখেরে লাভ কিছুই হবে না। যারা সংযত হয়েছে, ক'দিন পরে তারাই ফের নব উদ্যমে শুরু করে করবে কেশচর্চা।

ভাবতে-ভাবতেই অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটছিলেন বিভাসবাবু। পা দুটো সচল থাকলেও মন পড়ে আছে স্কুলে। আজকেই তো নিত্যদিনের মতো অরুণবাবু সেই একই টেপ বাজালেন। মাথা দুলিয়ে বললেন, "মূর্খরা লাঠির ভাষাই বোঝে স্যার। আপনি একবার অনুমতি দিন, তারপর দেখুন কী করি।"

কেশবপুরের শেষ প্রান্তে বাড়ি বিভাসবাবুর। বিকেলের ম্লান আলোয় বাড়ি ফেরার পথে এতটাই আনমনা হয়ে আছেন যে, কখন তিনি রাস্তার মাঝখানে এসে পড়েছেন খেয়াল নেই। হঠাৎ ছুটন্ত বাইক একটা ঘ্যাঁচ করে সামনে এসে ব্রেক কষতেই তাঁর সংবিত ফিরল। লজ্জিত হয়ে পড়লেন বিভাসবাবু। বাইক-আরোহীর কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে দেখলেন আরোহী তাঁর পূর্বপরিচিত। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র বাপি সামন্ত।

রাস্তার একপাশে বাইকটাকে স্ট্যান্ড করিয়ে দ্রুত এসে স্যারকে প্রণাম করল বাপি। তারপর বিনীতভাবে বলল, "অনেকদিন বাদে আপনাকে দেখলাম স্যার। এমন অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিলেন... আর-একটু হলে... কী এত চিন্তা করছিলেন?"

বুকের নীচে এখনও টিপটিপ করছে বিভাসবাবুর। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এত বড় একটা স্কুলের দায়িত্ব, চিন্তার কি আর শেষ আছে বাপি? তোমাদের সময়ে তোমরা অনেক বাধ্য ছিলে। আমরাও বেশ নিশ্চিন্তে থাকতাম। কিন্তু এখনকার ছাত্ররা বড্ড বেপরোয়া। উঁচু ক্লাসে উঠলেই সাপের পাঁচ পা দেখে! সেসব নিয়েই ভাবছি আর কী।"

বাপি সামন্তকে আড়ালে অনেকে হারকিউলিস বাপি বলে ডাকে। কেশবপুরে একটামাত্র জিম আছে। তার মালিক হল বাপি সামন্ত। বুকের চওড়া ছাতি আর স্ফীতকায় বাইসেপ্‌স-ট্রাইসেপ্‌সের জন্য ভয়-ভক্তিতে বাপিকে মান্যগণ্য করে লোকে। তা সেই বাপি হেডস্যারের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা নরম হয়ে পড়ল। মোলায়েম গলায় বলল, "আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্যা খুব গুরুতর। সমস্যাটা কী স্যার? আপত্তি যদি না থাকে তা হলে আমাকে বলতে পারেন।"

"কী আর বলব বাপি..." শুরুতেই হতাশায় মুখটা কেমন বেঁকেচুরে গেল বিভাসবাবুর। পরে ছাত্রদের কেশচর্চার কাহিনি সবিস্তারে জানানোর পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এত চেষ্টার পরেও ছাত্রদের আমি বাগে আনতে পারলাম না। এবার বুঝলে তো, কী বিপাকে আমি পড়েছি?"

হেডস্যারের ভেঙে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে কিছু একটা ভাবল বাপি। পরে চোয়াল শক্ত করে বলল, "এ কেস আমি সল্‌ভ করে দেব স্যার, নো প্রবলেম।"

হারকিউলিস বাপির শক্ত চোয়ালের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন বিভাসবাবু, "আমি কিন্তু বলপ্রয়োগের বিপক্ষে বাপি। সুতরাং ও পথে যদি কিছু ভেবে থাকো..."

"আপনার নীতি আমি জানি স্যার," বাপির ঠোঁটে ধূর্ত হাসি, "যা করার সব শান্তিপূর্ণভাবেই করব। ওদের প্যাঁচেই ঘায়েল করব ওদের।"

ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন বিভাসবাবু, "কী করতে চাও তুমি বাপি?"

"সেটা এই মুহূর্তে আপনাকে বলা যাবে না স্যার। তবে যা করব তাতে ছাত্রদের ছাঁট-কাণ্ডের যে পরিসমাপ্তি ঘটবে, তা আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি।"

॥ ৪ ॥

বাপির সঙ্গে বিভাসবাবুর মোলাকাতের দিনসাতেক পরের ঘটনা। টিফিন পিরিয়ড শুরু হতেই হন্তদন্ত হয়ে হেডস্যারের ঘরে ঢুকলেন স্বপনবাবু। চেপে রাখা খুশি চোখ-মুখ দিয়ে যেন উপচে পড়ছে অঙ্কস্যারের। উত্তেজনায় কথার খেই হারিয়ে বলে বসলেন, "কি... কিস্তিমাত স্যার!"

কাজে মগ্ন ছিলেন বিভাসবাবু। শুনেই আঁতকে উঠলেন, "কী সর্বনাশ! স্কুল চলাকালীন টিচার্সরুমে আপনারা দাবা খেলছেন!"

স্বপনবাবু হেসে ফেললেন, "এ কিস্তি সে কিস্তি নয় স্যার, এ হল ছাঁটের কিস্তি! খেল খতম, ছাঁট হজম! জঙ্গিরা সব কুপোকাত স্যার! আমরা এতদিন ধরে চেষ্টা করেও যা পারিনি, বাপি সামন্ত তা করে দেখিয়েছে।"

"বলছেন কী!" উত্তেজনায় চোখ থেকে একটানে চশমা খুলে ফেললেন বিভাসবাবু, "কী... কী করেছে বাপি?"

"অশোক, শ্যামল আর কাঞ্চনকে ধরে ন্যাড়া করে দিয়েছে।"

"অ্যাঁ!" বিস্ময় কাটিয়ে পরক্ষণেই তিরিক্ষি হয়ে উঠলেন বিভাসবাবু, "এটা কী করল বাপি! এতে লাভটা কী হবে?"

'হবে নয়, হয়ে গিয়েছে স্যার," স্বপনবাবু উচ্ছ্বসিত, "ন্যাড়া হওয়ার লজ্জায় ওই তিন বিচ্ছুই নাকি আত্মগোপন করেছে বাড়িতে। আর সে খবর পেয়ে বাকি ছাত্ররাও আতঙ্কে তাদের চুলের ছাঁট ঠিক করতে পৌঁছে গিয়েছে সেলুনে। বাপির কড়া ফরমান, হয় তিনদিনের মধ্যে ছাঁট সংস্কার করো, নইলে ন্যাড়া হও।"

অঙ্কস্যার স্বপনবাবুর কথায় মুখখানা তিতকুটে করে ফেললেন বিভাসবাবু, "এটা তো এক ধরনের শক্তিপ্রয়োগই। আমি তো বাপিকে বারণ করেছিলাম..."

"শক্তিপ্রয়োগ নয়, ন্যাড়াটাও একধরনের ছাঁট স্যার," গোঁফের আড়ালে মুচকি হাসলেন স্বপনবাবু, "বিখ্যাত ফুটবলার জিদানের ছাঁট। বাপির সাফ কথা, রোনাল্ডো ছাঁট, নেমার ছাঁট, পোগবা ছাঁট, ছাত্ররা যা খুশি ছাঁট দিক ক্ষতি নেই। কিন্তু অন্তিমে তাদের জিদান ছাঁটের আস্বাদ নিতেই হবে। না নিলে বাপির ছেলেরা তাদের ছাড়বে না।"

এবার আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলেন না বিভাসবাবু। হো-হো হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে বললেন, "বাপির এই উদ্যোগটার মধ্যে দারুণ একটা অভিনবত্ব আছে বটে। সত্যিই তো, এ তো আর গায়ে হাত দেওয়া নয়, এ হল ছাঁট থেকে ছাঁটান্তরে যাওয়া। স্কুলের স্বার্থে এটুকু আমাকে মেনে নিতেই হবে।"

ছবি: রৌদ্র মিত্র

আমার ছবি

দ্যাখো, ভাবো আর আঁকো

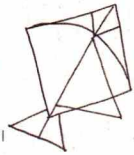

ছবি আঁকতে সবাই ভালবাসে। তাই এই ছবি আঁকার বিভাগ। এখানে আঁকা অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করো দেখি। আঁকা শেষ হলে রং করে ফ্যালো ছবিটাকে।

ছবি: কুনাল বর্মণ

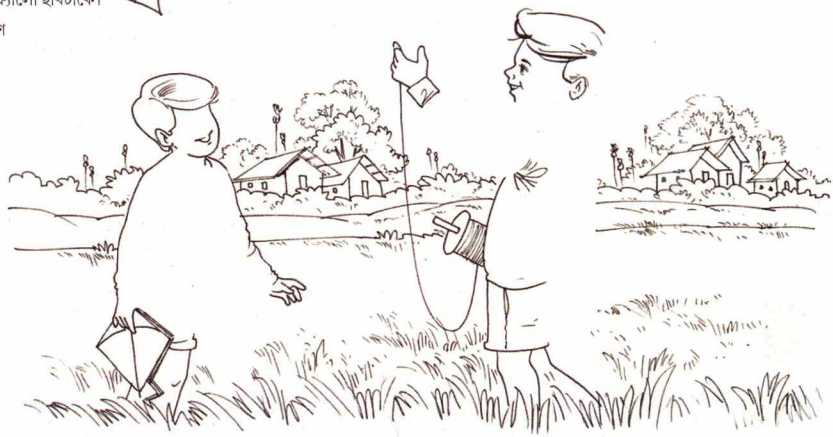

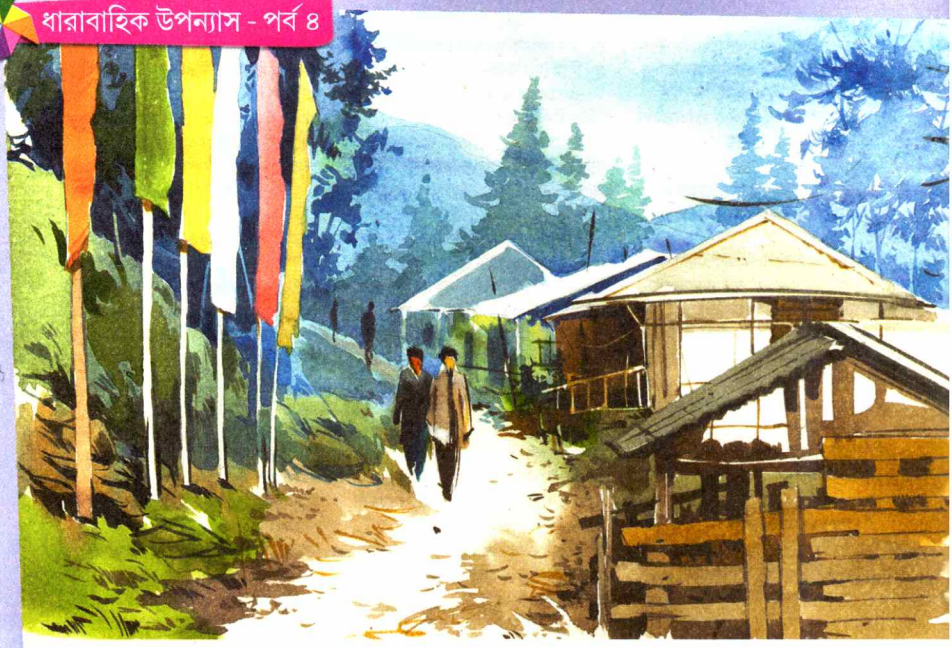

মিশন ব্রহ্মনাদ

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

*(**আগে যা ঘটেছে:** বিল্লা ও গুড্ডু ক্যাপ্টেন গড়াইকে জানায়, কালীপুজোয় বাজি পোড়ানোর সময় আগুন লাগার পর ব্রহ্মনাদ পুতুল বাবাজির আশ্রম থেকে উধাও হয়। ঈশান জবাহিরচাচাকে নিজের তৈরি রেডিয়ো উপহার দেয়। ওদিকে ক্যাপ্টেন ও বিল্লা জবাহিরচাচাকে অজ্ঞান করে ফেললে বিল্লা মেকআপ নিয়ে জবাহির সাজে। ক্যাপ্টেন, বিল্লা ও গুড্ডুর শয়তানির জেরে প্রথমে ঈশান ও পরে ঋজুলও জবাহিরের ঘর থেকে পুতুলের ঘরের চাবি আনতে ব্যর্থ হয়। জবাহিরের ঘরে আসা-যাওয়ার পথে কাকের ডাক শুনে ঋজুলের খটকা লাগে। তারপর...)*

॥ ১০ ॥

ফাদার টেবিলের মাথায় বসে দু'দিকে ঈশান আর ঋজুলকে নিয়ে খেতে বসলেন। খাওয়া শুরু করার আগে চোখ বন্ধ করে হাতজোড় করে প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন, "জিসাস, ইউ আর মাইটি অ্যান্ড স্ট্রং টু সাসটেন আওয়ার বডি..." ফাদারের সঙ্গে-সঙ্গে ঋজুল আর ঈশানও প্রার্থনা করতে শুরু করল, "থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য মিল উই আর অ্যাবাউট টু এনজয়..."

"...ইন জিসাস নেম, আমেন," বলে তিনজনে প্রার্থনা শেষ করে খেতে শুরু করলেন। ফাদার খাওয়ার সময় একটাও কথা বলেন না। খাওয়ার সময় কথা না বলার সেই শিক্ষা ছাত্রদেরও দিয়েছেন।

হস্টেলের ক্যান্টিনে সব ছাত্র যখন একসঙ্গে খায়, একটা শব্দও কেউ উচ্চারণ করে না। এখন হয়তো সেই অভ্যেস অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবে ঋজুল আর ঈশানের দু'জনেরই মনে পড়তে থাকল ফাদারের এই নিয়মানুবর্তিতার কথা। ওরাও চুপ করে খেতে থাকল।

চুপ করে জবাহিরচাচার অপূর্ব চিকেন কারি খেতে-খেতে ঋজুল একটু আনমনা হয়ে উঠছে। মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের ঝড় বইছে। ঈশান ব্রহ্মদত্যি দেখেছে। সেটা যদি মনের ভুলও হয়, সেই একই জায়গায় ও দু'বার কাকের ডাকের আওয়াজ শুনেছে। সেটা কিছুতেই মনের ভুল নয়। কাকের ডাকের আওয়াজটা আসছিল পাইন গাছের মাথা থেকে। অন্ধকার বলে ওই জায়গাটায় কিছু আছে কিনা দেখতে পায়নি। এটা একটা রহস্য। আর-একদিকে ফাদার বলেছেন, আজ রাতে চোরদের আসার প্রবল সম্ভাবনা আছে। তারা কীভাবে, কোথা দিয়ে আসবে জানা নেই। যেভাবে হোক ওদের ধরতেই হবে।

খাওয়া শেষ করার পর ফাদার ঋজুল আর ঈশানকে নিয়ে বসার ঘরে এসে বসে বললেন, "ইচ্ছে করে এবার কয়েকদিন আগে ক্রিসমাসের ছুটিটা দিয়েছি আর ব্রাদার নাইজেলকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি চাই আজকে চোর চুরি করতে আসুক এবং চুরিটা করতে সফল হোক।"

দু'জনে আরও অবাক গলায় বলল, "কী বলছেন ফাদার? আপনি নিজেই চাইছেন চুরিটা সফল হোক!"

"হ্যাঁ, চাইছি। কারণ, চুরি করতে ঢুকে কিছু চুরি করতে না পেরে ধরা পড়ার শাস্তিটা বড়ই কম। বরং বামাল চোর ধরা পড়লে শাস্তিটা অনেক বেশি হবে। আর আমরাও প্রমাণসমেত আসল উদ্দেশ্যটা ফাঁস করে দিতে পারব, যেটা তোমাদের আগেই বলেছি।"

"কিন্তু আর-একটু খুলে বলবেন ফাদার?" ঈশান বলল।

ফাদার একটু দম নিয়ে বললেন, "বেশ। তোমাদের তা হলে পুতুলটার কথা আর সেই অসৎ লোকটার কথা একসঙ্গেই বলি। আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে যখন এখানে প্রথম এসেছিলাম তখন আমি ছিলাম ব্রাদার ফ্রেডরিক। স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ানো ছাড়াও চার্চ আমাকে আর-একটা কাজ দিয়েছিল। এই অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোয়, যেখানে বাচ্চারা কোনও পড়ার সুযোগ পায় না, তাদের কাছে গিয়ে-গিয়ে তাদের পড়ানো, প্রভু যিশুর বাণী প্রচার করা।

"তা, একবার এভাবেই একটা গ্রামে গিয়ে এক আশ্চর্য মানুষের দেখা পেলাম। এক ছুতোরমিস্ত্রি, চৈতন্যবাবু। চৈতন্যবাবুর কাঠের আসবাবপত্র করার পাশাপাশি একটা নেশা ছিল ভেনট্রিলোকুইজ়ম। ভেনট্রিলোকুইজ়মকে বাংলায় মায়াস্বর বা স্বরক্ষেপণ বলে। উনি নিজে অসাধারণ দুটো কাঠের পুতুল বানিয়েছিলেন। পুতুলদুটোর পিঠের কাছে দুটো হাত ঢোকানোর গর্ত আছে। সেখানে অনেকগুলো শক্ত দড়ি আছে। সেইগুলো দিয়ে পুতুলের ঠোঁট নড়ানো, মাথা ঘোরানো থেকে আরম্ভ করে হাত-পা নড়ানো, সব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তোমাদের দেখে খুব ভাল লাগবে, ঈশান একটু আগে যে মেকানিক্যাল লিভারের কথা বলছিল, সেইসব লিভার, পুলি কী অসাধারণভাবে চৈতন্যবাবু ব্যবহার করেছেন।

"যাক গে, চৈতন্যবাবু কিন্তু পুতুলদুটো নিয়ে কোনও বাণিজ্যিক

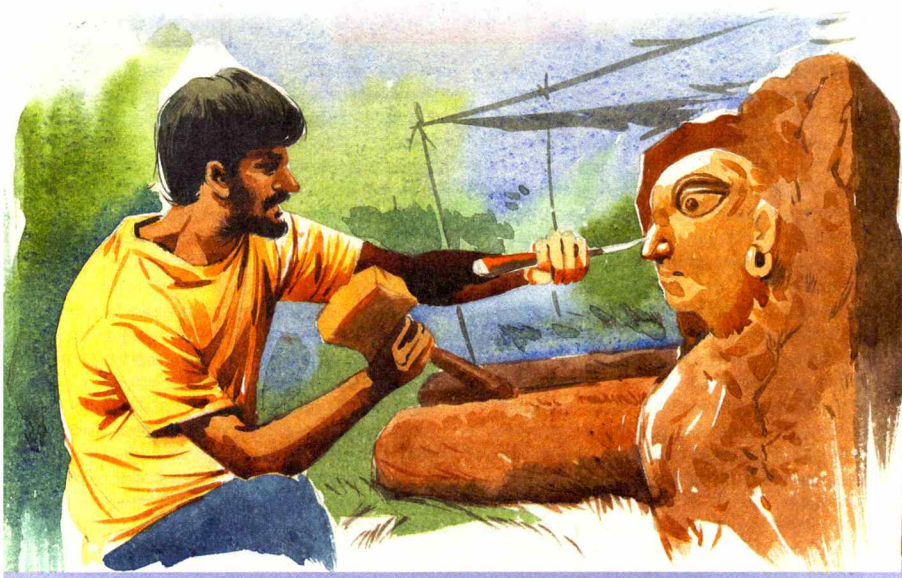

প্রদর্শন করতেন না। মনের আনন্দে মেলায় বা স্কুলের সামনে বাচ্চাদের ভেনট্রিলোকুইজ়ম দেখিয়েই খুব আনন্দ পেতেন। ব্যাপারটা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল। আমি চৈতন্যবাবুর কাছে ভেনট্রিলোকুইজ়ম শিখতে আরম্ভ করি। ঠিক এভাবেই চৈতন্যবাবুর আর-এক ছাত্র জুটে যায়। ত্রিলোক দাস। ত্রিলোকও খুব ভালভাবে রপ্ত করে মায়াস্বর। ওর একান্ত ইচ্ছে ছিল চৈতন্যবাবু যদি পুতুলদুটোর একটা ওকে দেন, তা হলে ও মেলায়-মেলায় গিয়ে 'শো' করতে পারে। চৈতন্যবাবু তাতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। তারপর চৈতন্যবাবুর বয়স হতে থাকল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে উনি আমাকে আর ত্রিলোককে ডেকে একদম স্নেহপরবশত এক-একটা পুতুল দিয়ে দেন। আমার কাছে সাদা-কালো একটা ছবি আছে। চৈতন্যবাবু, আমি, ত্রিলোক। আমার আর ত্রিলোকের কোলে পুতুল দুটো। এটাই কোর্ট থেকে শুরু করে মিডিয়ার কাছে অকাট্য প্রমাণ হবে।"

ফাদার ফ্রেডরিক দম নিতে একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "ত্রিলোকের খোঁজ আমি বহুদিন পরে পেয়েছিলাম। সে তখন এক ভেকধারী সাধু। নিজের নাম নিয়েছে ঋষিরাজ। শিলিগুড়ির কাছে এক আশ্রম খুলে বসেছে। পুতুলটার নাম দিয়েছে ব্রহ্মনাদ। ত্রিলোক ব্রহ্মনাদ আর ভেনট্রিলোকুইজ়ম দিয়ে মানুষ ঠকায় এখন। লোকে নানা অসুখবিসুখ, সমস্যা নিয়ে যখন ত্রিলোকের আশ্রমে আসে, তখন ও প্রচুর টাকাকড়ি নিয়ে ব্রহ্মনাদের মাধ্যমে আজগুবি সব সমাধান বলে। দিনের পর-দিন সরল সাদাসিধে মনের লোকেরা ওর ঠগবাজির শিকার হচ্ছে।"

ঋজুল জিজ্ঞেস করল, "আপনি গিয়েছিলেন ওই আশ্রমে?"

"না। তবে আমি এখানে আছি খবর পেয়ে ত্রিলোক একবার এসেছিল আমার কাছে থাকা পুতুলটার লোভে। আমাকে অনেক টাকার লোভও দেখিয়েছিল। কিন্তু বুঝতেই পারছ, সেসব বৃথা গিয়েছে। আমি জবাহিরকে দিয়ে সোজা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আর-এক কাণ্ড হয়েছে। গত কালীপুজোর দিন বাজি পোড়ানোর সময় ব্রহ্মনাদ পুড়ে গিয়ে ভিতরের সব কলকবজা খারাপ হয়ে গিয়েছে। অতএব ঋষিরাজের ভণ্ডামির ব্যবসা এখন বন্ধ। সে এখন মরিয়া, আমার কাছে থাকা পুতুলটা হাতানোর জন্য।"

ঈশান একটু চিন্তা করে বলল, "ফাদার, আপনি তা হলে সাংবাদিকদের ডেকে পুতুলটা দেখিয়ে এই ঘটনা শুনিয়ে দিলেই তো সবাই সত্যিটা জেনে যাবে।"

"ঠিকই বলেছ। আমিও সেটা একবার ভেবেছিলাম। কিন্তু কী হবে বলো তো? ত্রিলোক কিছুতেই স্বীকার করবে না। আমি চাই ওকে প্রমাণসমেত ধরে যথাযোগ্য শাস্তি দিতে। চৈতন্যবাবুর অত দক্ষতায় তৈরি পবিত্র পুতুলটা দিয়ে ধর্মের নামে মানুষ ঠকাচ্ছে যে, সে যথাযোগ্য শাস্তি না পেলে চৈতন্যবাবুর আত্মার প্রতি সম্মান দেখানো হবে না।"

ঈশান নিজের সুটকেসটা এনে খুলতে-খুলতে বলল, "আমার একটা প্ল্যান আছে ফাদার। আপনি যখন পুতুলটা চুরি করতে দেবেনই ভেবেছেন, তখন ওর ভিতরে আমার তৈরি কয়েকটা গ্যাজেট লাগিয়ে রাখি।"

ঈশানের সুটকেসের ভিতরটা দেখে ঋজুলের মুখ একেবারে হাঁ হয়ে গেল। অসংখ্য ছোট-বড় গ্যাজেট আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা সুটকেসটা। ফাদার ফ্রেড্রিক বললেন, "কীরকম প্ল্যান তোমার, যদি বুঝিয়ে বলো।"

ঈশান একটা ছোট দেশলাইয়ের বাক্সর মতো জিনিস দেখিয়ে বলল, "দেখুন, এটা একটা জি পি এস ট্র্যাকার কাম ভয়েস ব্রডকাস্টার। পুতুলটাকে নিয়ে চোর যেভাবে-যেভাবে যেখানে যাবে, গুগ্‌ল ম্যাপে তার পুরো রুট রেকর্ডেড হয়ে যাবে। এছাড়া আমি দুটো মাইক্রোভিশন নাইট ক্যামেরা লাগাব আর কয়েকটা সার্কিট..."

ঋজুল হাত তুলে বলল, "থাম। থাম। বুঝলাম অনেক ডেটা রেকর্ড হবে, কিন্তু আমরা কীভাবে দেখব?"

ঈশান একগাল হেসে একটা হাতঘড়ি বের করে বলল, "এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের স্পেশাল ঘড়িটা ফাদারের জন্য তৈরি করিয়ে নিয়ে এসেছি, তা দিয়ে। এই সুটকেসে যত গ্যাজেট দেখছিস, সব গ্যাজেটের কন্ট্রোল এই ঘড়ির একটা অ্যাপে আছে। সরাসরি ওয়াইফাই আর আই পি অ্যাড্রেস দিয়ে চলবে। ফাদার, আই পি অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা যে গ্যাজেট কন্ট্রোল করতে পারি, তাকে আই ও টি, মানে ইন্টারনেট অফ থিংস বলে। এইসব গ্যাজেট জাভা দিয়ে আমরা খুব সহজেই প্রোগ্রাম করতে পারি। আমি অবশ্য অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে অ্যাঙ্গুলার জাভা ইউজ় করি। ওটায় ওয়েব সার্ভিস লেখা বেশ ইন্টারেস্টিং। যেমন ধরুন জেসন রেন্ডারিং..."

"দেখিনি। তবে শুনেছি। প্রচুর চ্যালাচামুণ্ডা রেখেছে ত্রিলোক। তাদের বেশির ভাগই জেলখাটা ছিঁচকে চোর, গায়ে অসুরের মতো জোর, কিন্তু ভীষণ বোকাসোকা। ত্রিলোক আবার ওদের অদ্ভুত সব কঠিন-কঠিন বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছে।"

ঋজুল হাত তুলে বলল, "থাম ভাই তুই এবার! তুই তো দেখছি ভাই, ও-যুগের টমাস আলফা এডিসন থেকে এ-যুগের স্টিভ জোবস সব কিছু!"

ফাদার ফ্রেড্রিক বললেন, "আমি সত্যিই তোমার জন্য গর্বিত মাই সান! মনে-মনে একটা ভরসা পাচ্ছি, তোমার এইসব ইন্টারনেট অফ থিংসের গ্যাজেট দিয়ে আমার উদ্দেশ্য সাধন হবে।"

ঋজুল বলল, "নিশ্চয়ই ফাদার। আমিও ভরসা পাচ্ছি। আপনি শুধু বলুন ওই ঠগ ধড়িবাজ ঋষিরাজের আশ্রমটা আপনি দেখেছেন?"

"দেখিনি। তবে শুনেছি। প্রচুর চ্যালাচামুণ্ডা রেখেছে ত্রিলোক। তাদের বেশির ভাগই জেলখাটা ছিঁচকে চোর, গায়ে অসুরের মতো জোর, কিন্তু ভীষণ বোকাসোকা। ত্রিলোক আবার ওদের অদ্ভুত সব কঠিন-কঠিন বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছে।"

"কেন?"

"যাতে আশ্রমের মধ্যে অদ্ভুত বাংলা ভাষায় কথা বলার একটা পরিবেশ থাকে। ব্রহ্মনাদের মুখেও ও অদ্ভুত কঠিন-কঠিন বাংলা শব্দে কথা বলে, যাতে সাধারণ সরল মানুষ অর্ধেক শব্দের মানে বুঝতে না পেরে পুতুলটাকে খুব অলৌকিক জ্ঞানীগুণী ভাবে আর তাদের মনে ভক্তিটা বাড়ে।"

ঋজুল হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, "অদ্ভুত-অদ্ভুত শক্ত-

শক্ত বাংলা শব্দ। অবিমৃষ্যকারী, জাজ্বল্যমান, বেগশালী। ঈশান গাছের পিছন থেকে ব্রহ্মদত্যিটা বেরিয়ে এসে তোকে এইসব শব্দ বলেছিল না?"

ঈশান মুখ কালো করে বলল, "হ্যাঁ, মানে..."

ঋজুল উত্তেজিত হয়ে হাতের তালুতে ঘুসি মেরে বলল, "ফাদার, ব্রহ্মনাদের ব্রহ্মদত্যি হাজির হয়ে গিয়েছে। শুধু বুঝতে পারছি না সে কাকের মতো ডাকতে পারে কিনা। কুইক! আমাদের হাতে আর একদম সময় নেই। এক্ষুনি পুতুলটার কাছে গিয়ে গ্যাজেটগুলো লাগিয়ে দিতে হবে।"

ঈশান বলল, "কিন্তু দরজার চাবি? তুই তো বললি জবাহিরচাচা ভীষণ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।"

ফাদার ফ্রেডরিক বললেন, "উপায় অবশ্য আর-একটা আছে। ভিতরের ঘরে ঢোকার ডুপ্লিকেট চাবি আমার অফিসে আছে। ঋজুল বিকেলবেলায় স্কুল বিল্ডিংয়ে গিয়েছিল। বাইরের দরজা তো খোলাই আছে। চলো, তা হলে স্কুল বিল্ডিংয়ে যাই। আর যাওয়ার আগে থানায় একবার জানিয়ে রাখি, যাতে ওরা সতর্ক থাকে। ওরা সন্ধেবেলায় একবার টহল দিয়ে গিয়েছে। আমাকে বলে রেখেছে ফোন করলে দশ মিনিটের মধ্যে ওরা চলে আসবে। দাঁড়াও, আমার মোবাইলটা নিয়ে আসি।"

জানলার পাশে পড়ার টেবিলে মোবাইলটা কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ফাদার বললেন, "ইস, কোথায় যে মোবাইলটা রাখলাম।"

ঋজুল বলল, "দাঁড়ান, আমি আমার মোবাইল থেকে আপনাকে একটা কল করে দেখি।"

বলতে-বলতেই ঋজুল ফাদারের মোবাইলে কল করে সুইচড অফ পেল। ফাদার বললেন, "তা হলে কি চার্জ শেষ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল?"

ঈশান বলল, "আপনার থানার নম্বরটা মনে আছে?"

"ইনস্পেক্টর বক্সীর মোবাইল নম্বরটা ওই দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের গায়ে লেখা আছে।"

"ঠিক আছে, আমি দেখে নিয়ে কল করছি। আমার মোবাইল থেকে থানার সঙ্গে কথা বলে নিন। ঋজুল ঠিকই বলেছে, আমাদের হাতে তো সময় নেই। পুতুলটার ঘরে চলুন।"

॥ ১১ ॥

জবাহিরের ছোট্ট ঘর। সেই ঘরেই খাটের তলায় হাত-মুখ বেঁধে বন্দি জবাহির। খাটের পায়ার কাছে চুপ করে বসে চুলছে বিল্লা। আর অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনের চিন্তার মূল কারণ, ক্যাপ্টেন বুঝে ফেলেছে এই স্কুলে শুধু বুড়ো ফাদার আর দরোয়ান নেই। আছে অন্তত আরও একজন। সে যে ব্রাদার নাইজেল নয়, সেটা দূর থেকে দেখেই বুঝেছে। ছেলেটার লম্বা-লম্বা চুল-দাড়ি। এই ছেলেটা থাকার কোনও খবর স্বয়ং ঋষিরাজের কাছেও ছিল না। এখন বুঝতে হবে ছেলেটা কতটা বিপজ্জনক। ওদিকে গুড্ডুরও কোনও খবর নেই। কাকের ডাকের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। ও ধরা পড়ে গেল কিনা বুঝতে পারছে না। সেরকম বিপদ বুঝলে সোজা পিঠটান দিতে হবে। তারপর যা থাকে কপালে।

পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ বিল্লার দিকে চোখ পড়তেই

মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। এই অসহ্য দুশ্চিন্তার মধ্যে ব্যাটার চোখে ঘুমের ঢুলুনি। ক্যাপ্টেন ধমকে উঠল, "কম্যান্ডো আলফা, কী করছ?"

ভারী চোখটা কোনও রকমে খুলে জড়ানো গলায় বিল্লা বলল, "কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অবস্থান করছি।"

ক্যাপ্টেনের মেজাজটা গেল আরও খারাপ হয়ে। বিল্লাকে ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, "অবস্থান থেকে ওঠো। যাও বাইরে গিয়ে খোঁজ করো, কম্যান্ডো বিটা কোথায়?"

"আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি। তোমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে বুড়ো দরোয়ানটাই মনে হবে। পা টেনে-টেনে হাঁটা আর কাশির কথাটা মনে রেখো। তারপরেও কেউ সামনে চলে এলে ঘুসি মেরে শুইয়ে দেবে। আর কাক, কোকিল যার গলায় পার, ডেকে সিগন্যাল দেবে। বুঝেছ?"

"কপিড।"

বিল্লা ঘর থেকে সাবধানে বেরিয়ে এল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। বড় কোর্টইয়ার্ডটা পেরিয়ে স্কুল বিল্ডিং, হস্টেল বিল্ডিং, সব অন্ধকার। আকাশে ফুটফুটে চাঁদ। বিল্লা একটু চিন্তা করে নিল। কেউ যখন কোথাও নেই, তখন বুড়ো দরোয়ানটার মতো পা টেনে-টেনে চলা আর কাশির কী দরকার? স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে-হাঁটতে একটু এগোতেই গেটের বাইরে চোখ পড়ল। বাইরে কিছুটা ঢালের পরেই পাকদণ্ডী রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে একজোড়া জোরালো হেডলাইট এগিয়ে আসছে। তবে শুধু হেডলাইটই নয়, তার মধ্যে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে-নিভছে একটা নীল আলো। বিল্লার বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না, ওটা পুলিশের জিপ। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এরকম জিপে চাপার অভিজ্ঞতা আছে। আর-একবার সেই অভিজ্ঞতার ইচ্ছে নেই। জবাহিরের কোয়ার্টারে দৌড়ে ফিরে এল বিল্লা। তারপর হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "ক্যাপ্টেন, পুলিশ!"

মুহূর্তের মধ্যে ক্যাপ্টেন গড়াইয়ের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। "কোথায়?" বলতে গিয়ে ক্যাপ্টেনের গলাটা কেঁপে উঠল।

"এই তো, স্কুলের গেটের দিকে আসছে।"

ক্যাপ্টেন বাঁচার প্ল্যান মনে-মনে দ্রুত ঠিক করে নিল। ধরা পড়লে বিল্লা পভুক। নিজে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাবে। এমন সময় বাইরে থেকে ক্রমাগত ডাক শুনতে পেল, "ক্যা...ক্যা...ক্যা...ক্যা..." ক্যাপ্টেন মাথার চুল খামচে ধরল। আর কোনও উপায় নেই। এই ডাক শুনে পুলিশ এসেই গুলি চালাবে।

"ক্যাপ্টেন, কী করব?"

"কুল। কুল। মাথা ঠান্ডা। তুমি গেটের কাছে যাও।"

"এই শীতেও তো কুলকুল করে ঘাম দিচ্ছে। মাথার উপর দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে যাব ক্যাপ্টেন?"

"না, পা টেনে-টেনে। পুলিশ যেন তোমাকে বুড়ো দরোয়ান মনে করে। জিজ্ঞেস করলে বলবে সব ঠিক আছে। ভিতরে আসার দরকার নেই।"

মুহূর্তের মধ্যে ক্যাপ্টেন গড়াইয়ের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। "কোথায়?" বলতে গিয়ে ক্যাপ্টেনের গলাটা কেঁপে উঠল। "এই তো স্কুলের গেটের দিকে আসছে।" ক্যাপ্টেন দ্রুত মনে-মনে বাঁচার প্ল্যান ঠিক করে নিল। ধরা পড়লে বিল্লা পড়ুক। নিজে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাবে।

দুরুদুরু বুকে বিল্লা গেটের কাছে এগিয়ে গেল। যা সন্দেহ করেছিল তাই।

পুলিশের জিপ এসে ঢালের সামনে দাঁড়াল। এখান থেকে পায়ে হাঁটা একটা রাস্তা ঢাল বরাবর উঠে গিয়ে স্কুলের বড় লোহার বাহারি গেটটা। জিপের মধ্যে বসে ইনস্পেক্টর বক্সী মুখ তুলে গেটটা একবার দেখলেন। তারপর হাবিলদার সুকুমার গড়কড়িকে বললেন, "আজকে প্রেশারের ওষুধটা খেতে ভুলে গিয়েছি, বুঝেছ সুকুমার। এতটা ঢাল দিয়ে চড়াই ওঠার আগে তুমি একবার দেখে এসো তো ফাদার কেন সতর্ক হয়ে থাকতে বললেন।"

সুকুমার গড়কড়ি শীতকাতুরে। ভেবেছিল ইনস্পেক্টর বক্সীই খোঁজখবর করতে যাবেন। ও জিপের ইঞ্জিনের বনেটের গরমে হাত সেঁকবে। অগত্যা নিজের বিরক্তি, অনিচ্ছা লুকিয়ে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে ঢাল বেয়ে লোহার গেটটার কাছে উঠে এসে সে দেখল, গেটে তালা দেওয়া। তারপর গেটের বাইরে থেকে চিৎকার করে ডাকতে থাকল, "জবাহিরদাদা! ও জবাহিরদাদা!"

ডাকের পরেই চোখে পড়ল জবাহিরকে। এই ঠান্ডায় পায়ের ব্যথাটা নিশ্চয়ই বেড়েছে। সন্ধেবেলায় রুটিনমাফিক টহল দেওয়ার সময় রোজ যেমন পা টেনে-টেনে হাঁটতে দেখে, এখন যেন ভয়ানক খুঁড়িয়ে হাঁটছে। জবাহিররূপী বিল্লা গেটের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "বিদ্যাঙ্গনে অতি সুস্বাগতম।"

সুকুমার গড়কড়ি ঠান্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে হেসে উঠল, "হা হা! ফাদার ফ্রেডরিক ঠিকই বলেন, তুমি এখানে থেকে খুব ভাল বাংলা শিখে গিয়েছ। পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে দেখতে পাচ্ছি। তবে তোমার এতদিনের পুরনো কাশিটা তো সেরে গিয়েছে দেখছি। যা ঠান্ডা পড়েছে আজ। বিষে-বিষে বিষক্ষয় হয়ে কাশি সেরেছে, বুঝেছ।"

বিল্লা অমনি জিভ কেটে কাশতে আরম্ভ করে দিল। সুকুমার বলে উঠল, "ওমা দেখেছ, কথায় কথা পড়ে গেল আর তোমার কাশি শুরু হয়ে গেল। যাক গে, ঠান্ডায় তোমায় দাঁড় করিয়ে আর কাশিটা বাড়াব না। আচ্ছা, তোমাদের এখানে সব ঠিক আছে?"

"অতীব উত্তম। সুমধুরম।"

"কোনও চোরটোর আসেনি তো?"

বিল্লা আবার ভীষণরকম কাশতে-কাশতে প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাতে থাকল।

সুকুমার একটু আনমনা হয়ে বলল, "তা হলে ফাদার যে কেন ফোন করে সতর্ক থাকতে বললেন। যাক গে, চলি। ফাদারকে বোলো আমরা ঘুরে গেলাম।"

বিল্লা কাশতে-কাশতে সুকুমারকে টা টা করতে থাকল। সুকুমার জিপের কাছে ফিরে এসে ইনস্পেক্টর বক্সীকে বলল, "স্যার, সব ঠিক আছে। কোনও চোরটোর আসেনি।"

ইনস্পেক্টর বক্সী রেগে উঠে বললেন, "বুঝেছি কে করেছে। এ ব্যাটা ওই স্মাগলার দাঁতভাঙা কুট্টি সিংয়ের কাজ। ফাদারের নাম আমার ফোনবুকে আছে। অচেনা নম্বর থেকে ফাদার কখনও ফোন করেন না। তখনই একটা সন্দেহ হয়েছিল আমার। ব্যাটা কুট্টি সিং ফাদারের গলা নকল করে এই ঠান্ডায় পাকদণ্ডী খাওয়াল। কাল

সকালেই ব্যাটাকে ঘুরপথে নিয়ে গিয়ে ডবল পাকদণ্ডী খাইয়ে গারদে ঢোকাব।"

পুলিশের গাড়িটা চলে যেতেই বিল্লা লাফাতে-লাফাতে জবাহিরের কোয়ার্টারে ফিরে এল। জীবনে প্রথমবার পুলিশকে ধোঁকা দিতে পেরে ফুর্তিতে মনটা একেবারে ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে। ঘরে ঢুকে 'ঢিক্কা চিকা ঢিক্কা চিকা' বলে দু'পাক নেচে নিয়ে ক্যাপ্টেন গড়াইকে বলল, "কেমন দিলাম ক্যাপ্টেন?"

ক্যাপ্টেন দরজার ফুটো দিয়ে সবই দেখেছে। এই ঠান্ডাতেও টেনশনে ঘেমে উঠেছিল। খুব খুশি হয়ে বিল্লার কাঁধ চাপড়ে বলল, "ওয়েল ডান বয়। বিপদ-ফাঁড়া সব কেটে গিয়েছে। এবার সোজা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। শুধু ওই খক খক করে না কেশে ক্যা... ক্যা... করে ডেকে কম্যান্ডো বিটাকে একবার ডেকে নাও তো।"

বিল্লাকে আর ডাকতে হল না। দরজা ঠেলে গুড্ডু ঢুকে বলল, "আমি এসে গিয়েছি ক্যাপ্টেন। এই নিন বুড়ো ফাদারের মোবাইল।"

ক্যাপ্টেন বিস্মিত হয়ে গুড্ডুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কোথা থেকে ওরকম কর্কশ ডাক ডাকছিলে বলো তো?"

"পাইন গাছের মাথায় চড়তে হয়েছিল। আরে হয়েছিল কী, মোবাইলটা চুরি করে অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে ফিরছি। পাইন গাছটার সামনে একটা ছেলের মুখোমুখি। সেও ভ্যাবাচ্যাকা, আমিও ভ্যাবাচ্যাকা। ঘাবড়ে গিয়ে বাবাজির শেখানো কয়েকটা বাংলা শব্দ বলে সরসর করে পাইন গাছটার মাথায় উঠে পড়লাম। তবে ক্যাপ্টেন কাকের ডাক ডাকতে-ডাকতে একটা খুব উপকার হল। হেঁচকিটা বন্ধ হয়ে গেল। এবার থেকে জমিয়ে ঝাল খাব আর হেঁচকি উঠলেই কাকের ডাক ডাকব। আহা, কী ভাল টোটকা।"

"আচ্ছা, তোমাদের কি খাওয়া ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই? আমরা যাব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মিশনে আর তোমার চিন্তা, কীভাবে ঝাল চচ্চড়ি খাবে। মগডালে উঠে কী দেখলে বলো।"

"সব দেখে ফেলেছি ক্যাপ্টেন। বুড়ো ফাদারের সঙ্গে দুটো আরও ছেলে আছে। একটা তো রামভিতু, যার কথা বললাম। আর-একজন যখন আপনাদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, তখন আমি কাকের ডাক ডেকে আপনাদের সিগন্যাল দিচ্ছিলাম। তখনই তো বুঝলাম কাকের ডাকে হেঁচকি সেরে যায়।"

"উফ! থামবে, নাকি প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস দিয়ে বুঝিয়ে চুপ করাব?"

"না-না, থাক! আপনি যেমন বলবেন।"

"বুড়ো ফাদার কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু ছেলেদুটোর সঙ্গে হাতাহাতি হলে কাবু করতে পারবে?"

বিল্লা-গুড্ডু একসঙ্গে বলে উঠল, "কী যে বলেন। ও দুটোকে পটকাতে এক মিনিট লাগবে। হাতাহাতি করতে বড় ভাল লাগে।"

"হাতাহাতি শব্দটা ব্যতিহার বহুব্রীহি, মনে রেখো। দুটো হাত। পূর্বপদ অর্থাৎ আগের হাতটার সঙ্গে 'আ' আর পরপদ অর্থাৎ পরের হাতটার সঙ্গে 'ই'। এরকম 'আ, ই, আ, ই করতে-করতে হাতাহাতি করবে, মনে হবে কুংফু লড়ছ। যাক গে, তোমাদের প্রাইজ় ওই হাঁড়ির মধ্যে মাংস যা আছে ভাগ করে খেয়ে নাও। তারপর মিশন ব্রহ্মনাদের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ফাইনাল অ্যাকশন শুরু।"

॥ ১২ ॥

ফাদার ফ্রেডরিক, ঋজুল আর ঈশানের কাছে ঈশানের তৈরি বিশেষ হাতঘড়িটার কল্যাণে পরিষ্কার হয়ে গেল অনেক কিছু। ক্যাপ্টেন গড়াই বুঝতেই পারল না, বিল্লা আর গুড্ডুকে নিয়ে অন্তিম সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের যে প্ল্যান করছে, তার সমস্ত কথাবার্তা ঈশানের তৈরি জবাহিরের রেডিয়োর মধ্যে লাগানো ট্রান্সমিটার দিয়ে হাতঘড়ির অ্যাপে চলে আসছে। ফাদার ঋজুল আর ঈশানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্কুলের প্যাসেজের অন্ধকার একটা জায়গায়। সেখান থেকে কোর্টইয়ার্ড, জবাহিরের কোয়ার্টার, গেট সবকিছু চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওরা ওখান থেকে বেরলেই দেখা যাবে।

ফাদার ফ্রেডরিক ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "আমার তো এখন সবচেয়ে চিন্তা হচ্ছে জবাহিরকে নিয়ে। নিষ্ঠুরভাবে ওকে বেঁধে খাটের তলায় ফেলে রেখেছে।"

ঋজুল বলল, "বুঝতে পারছি ফাদার। তবে একটা নিশ্চিন্তি, ওরা জবাহিরচাচাকে আর কোনও আঘাত করেনি। আপনি যেরকম চেয়েছেন, আমরা কিন্তু ওদের ধরার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি।"

ঈশান চিন্তিত গলায় বলল, "পুলিশ কেন এসে গেট থেকে ফিরে গেল বুঝতে পারলাম না।"

"ফাদার তো পুলিশকে শুধু অ্যালার্ট থাকতে বলেছিলেন। এখানে তো ডাকেননি। তবে এটা তো বুঝেছিস যে, গেটের দিকে যেতে যাকে আমরা জবাহিরচাচা মনে করেছিলাম, সে আসলে জবাহিরচাচা নয়। ওই বদমাশগুলোর একজন। ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। সময় কিন্তু আর একদম হাতে নেই ঈশান। শুনলি তো, ওরা জবাহিরচাচার রান্না করা মাংস খেয়ে এক্ষুনি এদিকে আসবে।"

ফাদার ফ্রেডরিক বললেন, "কিন্তু জবাহির তো নিরামিষ খায়। অন্যদের জন্য কখনও মাংস রান্না করলে ওর পোষ্য ভুলুয়ার জন্য একটু রেখে দেয়।"

"সেটাই ওই হ্যাংলাগুলো খাচ্ছে। ফাদার, আপনি ঈশানকে নিয়ে শিগগিরি আপনার ঘর দিয়ে ওই পুতুলের ঘরটায় চলে যান। ঈশান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুতুলটার মধ্যে ওর গ্যাজেটগুলো লাগিয়ে ফেলুক। আমি দেখছি ওদের কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়। ওরা তিনজন। ক্যাপ্টেন কুল, আলফা আর বিটা। ক্যাপ্টেন আবার কথায়-কথায় বহুব্রীহি সমাস বলে। দেখাচ্ছি মজা বহুব্রীহিকে।"

ঈশান বলল, "তোর মনে আছে কিছু বহুব্রীহি সমাস? বীথিম্যাম যখন পড়াতেন, তখন তো বোর্ডের দিকে না তাকিয়ে আমার পিছনে লাগতিস।"

"দেখিয়ে দেব তোকে মনে আছে কিনা।"

"তোর কিছু মনে নেই। বহুব্রীহি সমাসের ডেফিনিশনই বলতে পারবি না। উলটোপালটা করিস না।"

ফাদার গম্ভীর হয়ে বললেন, "এখন তর্ক নয়। না-না ঋজুল, তোমাকে এভাবে একা বিপদে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। জানি না ওদের কাছে অস্ত্র আছে কিনা। তোমার কাছে তো কিছুই নেই।"

"আছে ফাদার। দেখবেন?"

হঠাৎ অন্ধকারে একটা খুব গম্ভীর আওয়াজ শুরু হল, 'ঢিপ, ঢিপ, ঢিপ, ঢিপ, ঝন, ঝন, ঢিপ...'

(ক্রমশ)

ছবি: কুনাল বর্মণ

ব্লু ফ্লাওয়ার্স ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল

হাইলাকান্দির এই স্কুল শিক্ষার আলো ছড়িয়ে চলেছে গত ৩১ বছর ধরে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য অসমের দক্ষিণে বরাক উপত্যকার এক প্রত্যন্ত, ছোট্ট শহর হাইলাকান্দি। ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো এই শহরে দোকানপাট, যানবাহন, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, এমনকী, ইংরেজ মাধ্যম স্কুলও আছে। তবুও যেন এখানকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া ছাড়াও চিত্রকলা, খেলাধুলো, সঙ্গীত-নৃত্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি মিলিয়ে সার্বিক সচেতনতার অভাব ছিল। এই অভাববোধ থেকেই ডঃ সত্যভূষণ পাল এই ছোট্ট শহরে এমন একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল খোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশ হবে। ডঃ পাল ছিলেন এই শহরের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র, যিনি পরবর্তীকালে শিলং এডমন্ডস কলেজ এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ক্ষিতীশরঞ্জন পাল

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সহজ কাজ নয় মোটেও। নতুন স্কুল চালু করতে গিয়ে ডঃ পালকে প্রথমেই মুখোমুখি হতে হয়েছিল আর্থিক সমস্যার। কিন্তু স্রেফ টাকার অভাবে যাতে এই মহৎ উদ্যোগ থেমে না যায়, তাই নিজের-নিজের সঞ্চয় নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ান তাঁর দাদা সাধন পাল, বোন আশা পাল, ভাই ক্ষিতীশরঞ্জন পাল ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না পাল। শিক্ষকতার ব্রত নিয়ে তরুণ প্রজন্মের কিছু ছাত্রছাত্রী শিলং থেকে এগিয়ে আসেন। তারপর আর পিছু ফিরে তাকানোর প্রয়োজন পড়েনি। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে ডঃ সত্যভূষণ পাল ও ক্ষিতীশরঞ্জন পালের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম নেয় ব্লু ফাওয়ার্স ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। প্রথমে মাত্র ১৬ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে চালু হয়েছিল এই স্কুল। নার্সারি, কেজি, ক্লাস ওয়ান, টু পেরিয়ে পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়। কালক্রমে চালু হয় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পঠনপাঠনও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল 'ব্লু ফাওয়ার্স ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল অ্যান্ড জুনিয়র কলেজ'। পরবর্তীকালে 'জুনিয়র কলেজ' অংশটুকু বাদ দিয়ে সরকারিভাবে যে নামটি নথিভুক্ত হয়, তা হল 'ব্লু ফাওয়ার্স ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল'। বর্তমানে স্বনামধন্য এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখতে-দেখতেই পার করেছে ৩১ বছর। নৌকোকে নিরাপদে নদী পার করানোর জন্য প্রয়োজন পড়ে দক্ষ কান্ডারির। ঠিক সেভাবেই একটি বিদ্যালয়কে সার্থকতার শীর্ষে নিয়ে যান সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক। ব্লু ফাওয়ার্স স্কুলকেও শৈশাবস্থা থেকে যৌবনে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন এই স্কুলের প্রিন্সিপাল রঞ্জিত বিশ্বাস। ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর পরে ওই পদে আসীন হয়েছেন এবং যথাযথভাবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ রাধাকান্ত তাঁতি, ডঃ অসিতকুমার ভট্টাচার্য এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষক ক্ষিতীশরঞ্জন পাল।

স্কুল শুরুর সময় শিলং থেকে যে শিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষকরা এসে এই স্কুলে শিক্ষকতার ভার নিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থী। কিছুদিন পর তাই তাঁরা ফিরে গেলেন। ততদিনে এগিয়ে

এসেছেন স্থানীয় শিক্ষকরা। তাঁদের সঙ্গে থেকে গেলেন স্বর্গীয় সুজিত চক্রবর্তী, যাঁর বলিষ্ঠ পরিচালনা ও সস্নেহ শাসনে কচিকাঁচারা লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে খেলাধুলো, সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে মানুষ গড়ার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বপন দাস, বিজিত দাস, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, স্বরাজ সোম, দীপালি দে, মধুমিতা ভট্টাচার্য, মানসী দেবরায়, রুমা দে, শম্পা পালের নাম। এঁদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরলস প্রচেষ্টাই আজ বিদ্যালয়কে দিয়েছে খ্যাতি ও যশ। বিদ্যালয়ে একাধিক ত্রিতল ভবন আছে। প্রযুক্তিগত সমস্ত সুবিধেও এখানে পর্যাপ্ত। প্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ, দরকারি আসবাবপত্র, স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ক্লাস, সঙ্গীত-নৃত্য ও তবলার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য একাধিক পরীক্ষাগার— বিদ্যালয়ে আছে এর সবটাই। পুঁথিগত লেখাপড়ার বাইরে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ়, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতার মতো নানা কার্যকলাপে অংশ নিতে ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করা হয়। এই মুহূর্তে এই স্কুলে লেখাপড়া করে সহস্রাধিক ছেলেমেয়ে।

প্রতি বছর 'সেবা' (অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ) পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৯০% ছেলেমেয়ে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। এই প্রতিষ্ঠানে প্রি-প্রাইমারি, লোয়ার প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি, সব স্তরেই যত্নসহকারে পাঠদান করা হয়।

বাৎসরিক খেলাধুলো এবং বছরভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসে স্কুলে। খেলাধুলোয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বরাবরই পারদর্শিতা দেখিয়ে এসেছে। একাধিকবার তারা জেলাভিত্তিক ক্রীড়ামহোৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে। জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তারা অংশ নেয় ও স্কুলের নাম উজ্জ্বল করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রী সপ্তপর্ণা চক্রবর্তী সঙ্গীতে সর্বভারতীয় স্তরে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় ছায়াছবির নেপথ্য-গায়িকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সপ্তমিতা বিশ্বাস এবং আরও অনেকেই কলকাতার বিভিন্ন নামী নৃত্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। সর্বভারতীয় স্তরে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-শিক্ষক-ব্যবসায়ী হয়ে সফল জীবন কাটাচ্ছেন, এই স্কুলের এমন প্রাক্তনীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। হাইলাকান্দি ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়তে আসে। পুঁথিগত লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি তাদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এই প্রতিষ্ঠানের নিরলস চেষ্টা জারি রয়েছে। থাকবেও।

নিজস্ব প্রতিনিধি

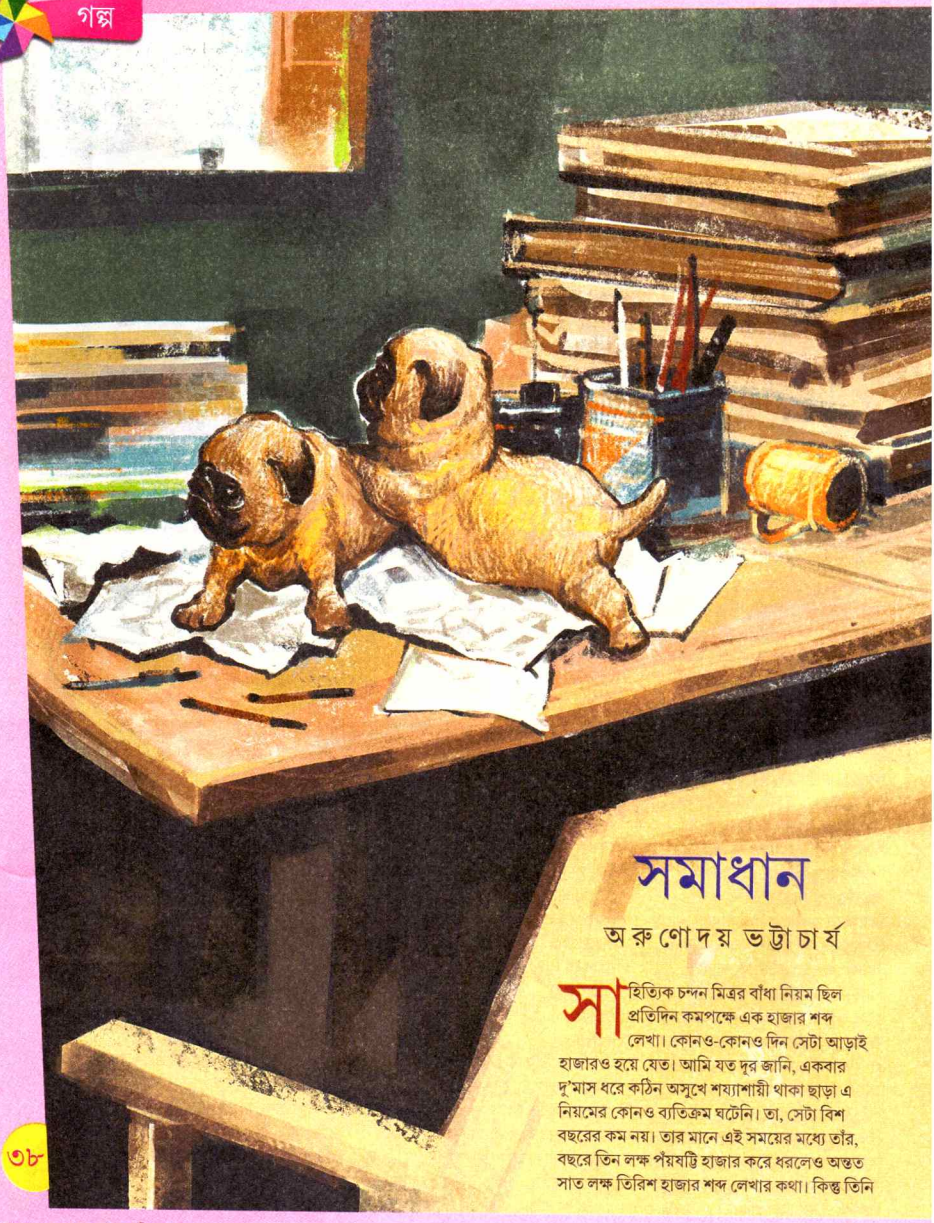

সমাধান

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

সাহিত্যিক চন্দন মিত্রর বাঁধা নিয়ম ছিল প্রতিদিন কমপক্ষে এক হাজার শব্দ লেখা। কোনও-কোনও দিন সেটা আড়াই হাজারও হয়ে যেত। আমি যত দূর জানি, একবার দু'মাস ধরে কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী থাকা ছাড়া এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তা, সেটা বিশ বছরের কম নয়। তার মানে এই সময়ের মধ্যে তাঁর, বছরে তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার করে ধরলেও অন্তত সাত লক্ষ তিরিশ হাজার শব্দ লেখার কথা। কিন্তু তিনি

লিখেছিলেন সাঁয়ত্রিশ লক্ষেরও বেশি! এখন চন্দন মিত্রর বয়স ঊনপঞ্চাশ।

এত দূর শোনার পর শিঙ্কুর আর ধৈর্য থাকল না। মাথার চুল ঝাঁকিয়ে ফরসা কপাল কুঁচকে সে ধমকে উঠল, "ছোটকু, এটা গল্প হচ্ছে, না অঙ্কের সমস্যা? খালি তো হিসেবই কষছ!"

"ওই দ্যাখো! যাঁর গল্প শোনাব, তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা ভাল না?"

"তোমার চন্দন মিত্রর জীবনী শুনে কী হবে? তাঁর লেখা কোনও ইন্টারেস্টিং গল্প থাকে তো তাড়াতাড়ি শোনাও।"

শিঙ্কু এখন সপ্লেন্ডিডা স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্রী। গল্পের ভাল-মন্দ ঝানু সমালোচকের মতো বোঝে। তবু ছোটবেলা থেকে ওকে রাগানোর স্বভাবটা আমার রয়ে গিয়েছে।

তাই বললাম, "চন্দন মিত্রর জীবনী ইন্টারেস্টিং হতে পারে না ভাবছিস? তবে শোন। ন'বছর বয়সে ওঁর বাবার মৃত্যু হয়। আঠারো বছরে উনি রোজগার শুরু করেন। সাতাশ বছরে বিয়ে করেন। আর ছত্রিশ বছরে উনি মাতৃহীন হন..."

"আহ! কী হচ্ছে কী?" শিঙ্কু এবার সত্যিই খেপে গিয়ে আমার পিঠে একটা কিল মারল, "আমাকে নয়ের নামতা শেখানোর দরকার নেই!"

রাগ করে সে চলেই যাচ্ছিল আমার ঘর থেকে। সুতরাং আমার আর বলা হল না যে, চন্দনবাবুর পঁয়তাল্লিশ বছরে স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। অনেক সেধে একটা চকোলেট দিয়ে ওকে গল্পটা শুনতে রাজি করালাম। শুনে ও-ই বলল, "দাও একটা ভাল পত্রিকায় পাঠিয়ে!"

আমিও তাই করলাম। এখন দেখি কী হয়!

অবশ্য চন্দন মিত্রর প্রসঙ্গটা মোটেই ধান ভানতে শিবের গীত নয়। গল্পটা ওঁরই মেয়ে সান্ত্বনার অভিজ্ঞতার কাহিনি। তার মুখ থেকেই শুনেছি আমি।

সান্ত্বনা খুব কুকুর ভালবাসে। সব রকম কুকুর নয়, একটু আদুরে ধরনের কুকুর। মানে যারা বেশি রেগে বিশ্রী গর্জন করে না। বেশ নরমসরম চেহারা, কথায়-কথায় লেজ নেড়ে বা চেটে দিয়ে খুশি প্রকাশ করে, আর জড়িয়ে ধরে সখীর মতো সোহাগ জানায়। স্পিৎজ়, স্প্যানিয়েল, পাগ সব মিলিয়ে ন'টা কুকুর আছে তার। কুকুরগুলোর নামকরণ সান্ত্বনা করেছে মিলিয়ে-মিলিয়ে। যেমন, লটি, নটি, ঝটি, স্পটি, ডটি, জটি, ব্লটি, এমনকী, শেষ পর্যন্ত টুটি এবং ফুটি। তাদের খাওয়াদাওয়া, তদ্বির, চিকিৎসায় সাহিত্যিকের মাসে তিন-চার হাজার খরচ হয়। নেহাত নিয়মিত লেখা থেকে প্রচুর উপার্জন করেন বলেই সামলাতে পারছেন মেয়ের বায়না।

তবু তিনি মাঝে-মাঝে বলেন বিরক্ত হয়ে, "খুকু, তোমার এই পোষ্যদের অত্যাচারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছি দিন-দিন! ওরা আমায় বাধ্য করে ওদের সঙ্গে খেলতে!"

সান্ত্বনা হেসে বলে, "কিন্তু বাপি, ওরা কত মিষ্টি বাচ্চা বলো!"

এই মিষ্টি এবং আহ্লাদি দুটো পাগ একদিন সত্যিই ভীষণ বেয়াদপি করে বসল।

টুটি-ফুটি জুটির বয়স মাত্র ছ'-সাত মাস। কোনওদিন যা করেনি, আজ তারা সেরকম একটা দুষ্টুমি করে বসল। খেলতে-খেলতে তারা লাফিয়ে উঠল চন্দন মিত্রর চেয়ারে এবং সেখান থেকে তাঁর লেখার টেবিলে। লেখক তখন বাথরুমে চান করতে-করতে সুর করে গাইছিলেন, "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে..."

টেবিলে পড়েছিল তাঁর গল্প 'অমাবস্যার রাত'-এর পাণ্ডুলিপি। সেটা আজকেই 'অম্লমধুর' পত্রিকার সম্পাদক নিতে আসবেন পুজোসংখ্যায় ছাপার জন্য। হাতে-হাতে আটশো টাকা দিয়ে যাওয়ার কথা।

টেবিলে উঠে টুটি-ফুটি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল অমাবস্যার রাত-এর উপর। আঁচড়ে-কামড়ে, লালা মাখিয়ে, কুঁচকে, পাকিয়ে সেটাকে একটা কাগজের বলে পরিণত করার চেষ্টা করল তারা। বল নিয়ে খেলতে খুব ভালবাসে তো দুষ্টুদুটো!

এই করতে-করতে হঠাৎ ওদের একজনের মুখে ফুটে গেল কাগজে আটকানো আলপিনটা।

ব্যস! কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ...আর্ত চিৎকার করতে-করতে টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে এল সান্ত্বনার কাছে। পিছন-পিছন অন্যটাও। সান্ত্বনা স্কুলে যাওয়ার আগে বই-খাতা গুছোচ্ছিল। হঠাৎ সেই করুণ আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে চেয়ে দেখল, টুটি ছুটে আসছে দুদ্দাড়িয়ে। ওর মুখটা দু'হাত দিয়ে তুলে ধরতেই সান্ত্বনার নজরে পড়ল, কষের কাছে রক্তের দাগ।

স্নেহময়ী মা'র মতো টুটিকে মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে অভয় দিয়ে শান্ত করল সান্ত্বনা। ফ্রিজ় থেকে বরফ বের করে লাগিয়ে দিল ক্ষতস্থানে। তারপর জেরা করল টুটি-ফুটিকে, "কী করে কাটল? কোথায় বাঁদরামি করতে গিয়েছিলে? বলো শিগগির। কী করছিলে?"

ফুটিই ছোটাছুটি করে সান্ত্বনাকে নিয়ে এল তার বাবার টেবিলের কাছে। চেয়ারে লাফিয়ে উঠে টেবিলের দিকে তাকিয়ে খ্যাঁও-খ্যাঁও করে সারমেয় ভাষায় বুঝিয়ে দিল, ওইখানে খেলতে গিয়ে বিপত্তিটা ঘটেছে।

"কী সর্বনাশ! তোরা বাপির লেখার টেবিলে উঠেছিস!" বলে এগিয়ে আসতেই কাগজের দলাটা চোখে পড়ল। তারপর সেটা অনেক কষ্টে খুলে লক্ষ করে যা বুঝল, তাতে তার মাথা ঘুরে গেল।

কাল থেকে তো বাপি এই গল্পটাই লিখছিল। এই তো অমাবস্যা... পর্যন্ত পড়া যাচ্ছে, বাকিটা ছিঁড়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে।

এবার আর রক্ষে নেই। তার সবক'টা কুকুরকে বাপি নির্ঘাত বাড়ি থেকে তাড়াবে। বিশেষ করে এই দুই অপরাধীকে। সান্ত্বনার জীবনে তা হলে কী সান্ত্বনা থাকবে?

রাণুমাসি, যে একাধারে তাদের রান্না ও ঘর পরিষ্কারের কাজ করে, রান্না শেষ করে বাড়ি চলে গিয়েছে। সান্ত্বনা আর তার বাপি একসঙ্গে খেয়ে নেবে এবার।

কিন্তু তার আগেই বাথরুম থেকে বেরিয়েই যদি চন্দনবাবুর চোখ পড়ে টেবিলে ওই পাণ্ডুলিপির ধ্বংসপিণ্ডে!

না, তা হতে দেওয়া যায় না!

'পরে বাপিকে যা হোক একটা অজুহাত দেওয়া যাবে, এখন এই জখম লেখাটাকে গায়েব তো করে ফেলি!' ভেবে যেই সান্ত্বনা সেটা নিয়ে এক পা এগিয়েছে রান্নাঘরের দিকে, অমনি ব্যস্ত হাতে কেউ ঘন-ঘন দু'বার ডোরবেল বাজাল।

তারপরই আগন্তুক হাঁক দিল, "চন্দনবাবু আছেন নাকি? ও চন্দনবাবু..."

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়!

গলা শুনেই সান্ত্বনা বুঝল, অন্নমধুর-এর সম্পাদক মহাদেব দাস। ভদ্রলোক বেঁটে, কালো, হলদেটে চোখ, তাগড়াই গোঁফওয়ালা আর বাজখাঁই গলা।

টেবিলের পাশে ক্ষতবিক্ষত পাণ্ডুলিপি ফেলে সান্ত্বনা ছুটল দরজা খুলতে। টুটি-ফুটিও তার সঙ্গে গেল, আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাতে।

সান্ত্বনা ভাবল যা হোক কিছু বলে মহাদেববাবুকে এখন বিদেয় করতেই হবে। দরজা খুলেই তড়বড় করে বলল, "ও আপনি... বাপি তো একটু আগেই..."

ও বলতে যাচ্ছিল, ওর বাপি বেরিয়ে গিয়েছে একটা জরুরি কাজে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ব্যস্ত পায়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে চন্দনবাবু ওদের কাছে এসে পড়লেন।

"আসুন, আসুন, মহাদেববাবু। একটু বসুন। আমরা বাপ-বেটিতে দুটো মুখে দিয়ে নিই। ওর আবার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে না হলে।"

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! আপনারা শান্তি করে খান। আমি বসছি," বলতে-বলতে চারটি কুকুরের শোঁকাশুঁকির মধ্যে দিয়ে মহাদেব দাস একটা চেয়ারের দিকে এগোলেন।

রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে সান্ত্বনা বাবার আগে-আগে কিচেন কাম ডাইনিং রুমে এল। দু'জনের ভাত-তরকারি বেড়ে নিয়ে খেতে বসল। কিন্তু কিছুই যেন আজ আর গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। বারবার তার মনে হল, এ অশান্তির চেয়ে সব কথা খুলে বলে টুটি-ফুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ভাল। কিন্তু কিছুতেই সাহসে কুলোল না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল চন্দনবাবুরও ঠিক খাওয়ায় মন নেই। চচ্চড়িটা আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে অন্যমনস্কভাবে এক টুকরো ঢ্যাঁড়স দাঁতে কাটছেন। একটু পরেই তো হাটে হাঁড়ি ভাঙবে! তখন সত্য গোপন করার জন্য বাপি তাকে আরও বকবে।

ভাবতে-ভাবতে আর থাকতে না পেরে সবে সান্ত্বনা বলেছে, "বাপি,একটা খুব খারাপ..." ঠিক সেই সময় চন্দনবাবুও বলে উঠলেন, "জানিস খুকু, একটা জিনিস..."

দু'জনের কথায়-কথায় ধাক্কা লাগল। থেমে গেল দু'জনেই।

তারপর চন্দনবাবু বললেন, "সরি, তুই কী যেন বলতে যাচ্ছিলি?"

সান্ত্বনা বলল, "না, তুমি বলো বাপি, কী বলছিলে?"

চন্দনবাবু গলা ঝেড়ে বললেন, "ভাবছিলাম মহাদেববাবুকে কী বলব?"

সান্ত্বনার মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল উৎকণ্ঠায়। মুখে বলল, "কেন?"

"দ্যাখ, ওঁর পত্রিকার জন্য গল্পটা লিখেছি বটে, কিন্তু অমাবস্যার রাত লেখাটা মোটেই জুতসই হয়নি। মানে, লিখে আমি তৃপ্তি পাইনি। ওদের আর কী! আমার নামডাক আছে, ছাপিয়ে দেবে! যারা পড়বে, তারা কিন্তু জোরে-জোরে না হলেও মনে-মনে আমার নিন্দে করবে। অথচ ভদ্রলোককে কথা দেওয়া আছে। টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই!"

শুনে আশান্বিত হয়ে সান্ত্বনা বলল, "বাপি, একটা কথা বলব-বলব করেও ভয়ে বলতে পারছি না তোমায়..."

"কী কথা? বলে ফ্যাল, বলে ফ্যাল।"

সান্ত্বনার মুখে টুটি-ফুটির কুকীর্তির কথা শুনে রাগের বদলে মৃদু হাসি খেলে গেল লেখকের মুখে। বললেন, "আশ্চর্য! ওরা কি টেলিপ্যাথিতে জানল যে, লেখাটা অখাদ্য হয়েছে, অথবা ওদের খাদ্য হয়েছে?"

সান্ত্বনা বলল, "কিন্তু বাপি, দুষ্টুটার উচিত শিক্ষাও হয়েছে। আর কোনওদিনও তোমার টেবিলে উঠবে না।"

ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে একটু নাটক করলেন চন্দন মিত্র।

বললেন, "মহাদেববাবু, আপনার গল্প রেডি।"

মহাদেব দাস বললেন, "আপনার চেকও রেডি স্যার।"

লেখার টেবিলের কাছে গিয়ে চমকে ওঠার ভান করলেন চন্দনবাবু, "গল্পের পাণ্ডুলিপিটা কোথায় গেল?"

তারপর এদিক-ওদিক হাতড়ে টেবিলের একপাশ থেকে দলাপাকানো পাণ্ডুলিপিটা কুড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী! এটার এ অবস্থা করল কে? কী সর্বনাশ! দেখুন-দেখুন মহাদেববাবু, আপনার অমাবস্যার রাত... রাত জেগে লেখা মশাই! ছিঁড়ে, দুমড়ে, চেটে, কামড়ে ম্যাডাগাস্কার করে রেখেছে!"

সেই দলিত, বিধ্বস্ত পাণ্ডুলিপি মহাদেববাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চন্দনবাবু ভীষণ ধমক লাগালেন মেয়েকে। তারপর তার পোষ্যদের উদ্দেশে গর্জন করে বললেন, "পাজি, নচ্ছার, ইডিয়ট, অকৃতজ্ঞ! দূর করে দেব সবক'টাকে বাড়ি থেকে! আমার লেখার টেবিলে উঠে আমার লেখা গেলা? তিনবেলা খেয়ে তোমাদের পেট ভরছে না?"

মহাদেববাবু বুঝলেন লেখার শোকে লেখক এখন পাগল। আর কোনও কথা না বলে সুড়সুড় করে কেটে পড়লেন।

তিনি চলে যাওয়ার পরই বাপ-বেটিতে হা-হা হো-হো করে হেসে উঠল গলা ছেড়ে।

চন্দনবাবু বললেন, "জানিস খুকু, নিজের লেখা নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলা বা আগুনে দেওয়া খুব কঠিন কাজ। ভাবছিলাম কী করব। তোর টুটি-ফুটি আমার সমস্যা মিটিয়ে দিল।"

সান্ত্বনা বলল, "বাপি, তুমি কী ভাল!"

চন্দনবাবু বললেন, "শেক্সপিয়রের অজস্র স্মরণীয় লাইনের মধ্যে একটা হল, 'ফেয়ার ইজ় ফাউল, অ্যান্ড ফাউল ইজ় ফেয়ার।' বুঝলি খুকু, কথাটা ম্যাকবেথ নাটকে ডাইনিদের মুখে বসানো হলেও এর মধ্যে এক পরম সত্য রয়েছে। জীবনে অনেক সময় আমাদের বুঝতে হয়,

'মন্দ আছে ভালয়
'আবার ভাল আছে মন্দে!'"

টুটি-ফুটি গলা মিলিয়ে 'ঘাঁক' শব্দে চন্দনবাবুর কথায় সমর্থন জানাল।

ছবি: প্রীতম দাশ

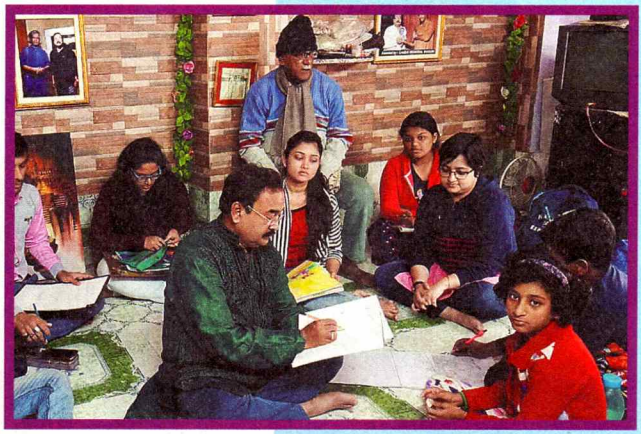

শুরু থেকেই বাচ্চাদের মানসিক বিকাশের সঙ্গী হতে চেয়েছে এই শিল্পকেন্দ্র।

তুলিকা আর্ট ইনস্টিটিউট

তুলিকা আর্ট ইনস্টিটিউটের সূচনা ১৯৯০ সালে। যে মানুষটির হাত ধরে প্রতিষ্ঠানের পথচলা শুরু, তিনি হলেন মাইকেল বসু। বর্তমানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক মাইকেলবাবু নিজেও একজন চিত্রশিল্পী। চিত্রকলায় তাঁর হাতেখড়ি প্রকাশ কর্মকারের কাছে। মাইকেলবাবু নিজের শিক্ষাগুরু মনে করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী সমীর আইচকে। তাঁর কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন এবং এখনও শিখে চলেছেন। তিনি মনে করেন যারা সৃষ্টি করতে পারে, তারা কোনওদিন কোনও খারাপ কাজ করতে পারে না। সেই ভাবনা থেকেই এলাকার ছেলেমেয়েদের শিল্পকলার পাঠ দিতে 'তুলিকা'র জয়যাত্রা শুরু। সেই সময়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন মাইকেলবাবুর মা। প্রথম থেকেই আলাদা করে উদ্যোগ নেওয়া হয় দুঃস্থ বাচ্চাদের শেখানোর জন্য। প্রথমদিকে দু'-চারজন দুঃস্থ বাচ্চা ছিল, এখন রয়েছে প্রায় ৭০-৮০ জন। ইতিমধ্যে সুভাষগ্রাম, গড়িয়া, শ্যামবাজার, বোসপুকুর, কলেজ স্ট্রিটসহ আরও বহু জায়গায় মোট ৪২টি শাখা মিলিয়ে এখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের উপর। শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন মোট ১৭জন। শুরুর দিন থেকেই মাইকেলবাবুকে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছেন স্ত্রী তনুশ্রী বসু, মেয়ে অঙ্কিতা বসু, অর্পিতা বসু, মেঘনাদ সাঁপুই, প্রশান্ত পালের মতো ব্যক্তিরা। এই স্কুলের উদ্দেশ্য বাচ্চাদের শুধু ছবি আঁকা শেখানোই নয়, বরং তাদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা পরবর্তীকালে আর্ট কলেজের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং ভবিষ্যতে শিল্পী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

মাইকেল বসু

নিয়মিত ক্লাসের পাশাপাশি প্রতি বছর চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী হয় মূলত বিড়লা আকাদেমি বা আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে। সেখানে ছাত্রদের ছবি বিক্রিও হয়। সেখানে যেমন সমীর আইচ, ওয়াসিম কপূর, গণেশ হালুই, যোগেন চৌধুরীর মতো নামকরা চিত্রশিল্পীরা আসেন, তরুণ শিল্পীদের অনুপ্রেরণা দিতে তেমনই আসেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, গৌতম ঘোষের মতো বিনোদন জগতের তারকারাও। শেখার কোনও বয়স হয় না। তাই তিন বছরের খুদের পাশাপাশি এখানে আঁকা শিখতে আসেন ৭১ বছরের বৃদ্ধ উৎপল রক্ষিতও। কনটেম্পোরারি, আউটডোর, পোর্ট্রেট, পারস্পেকটিভ, ফোলিয়েটসহ শিল্পকলার অনেক বিষয়ই ধাপে-ধাপে শেখানো হয়। পরীক্ষার ব্যাপারে বাইরের রাজ্যের কোনও বোর্ডের সাহায্য নেওয়া হয় না। সমীর আইচ আর্ট আকাদেমির নিজস্ব বোর্ড এখানে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। স্কুল চালানোর পাশাপাশি থিমের কাজ করে মাইকেলবাবু পেয়েছেন প্রচুর পুরস্কার। এছাড়া এসেছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক পুরস্কার। তাঁর কাছে বিশেষ স্মরণীয় মুহূর্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ। তিনি চান, প্রতিটি বাচ্চা ছোট থেকেই যেন নিজের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে পারে। অভিভাবকরাও যেন তাদের উৎসাহ দেন। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশও অত্যন্ত জরুরি বলেই তাঁর মত।

নিজস্ব প্রতিনিধি

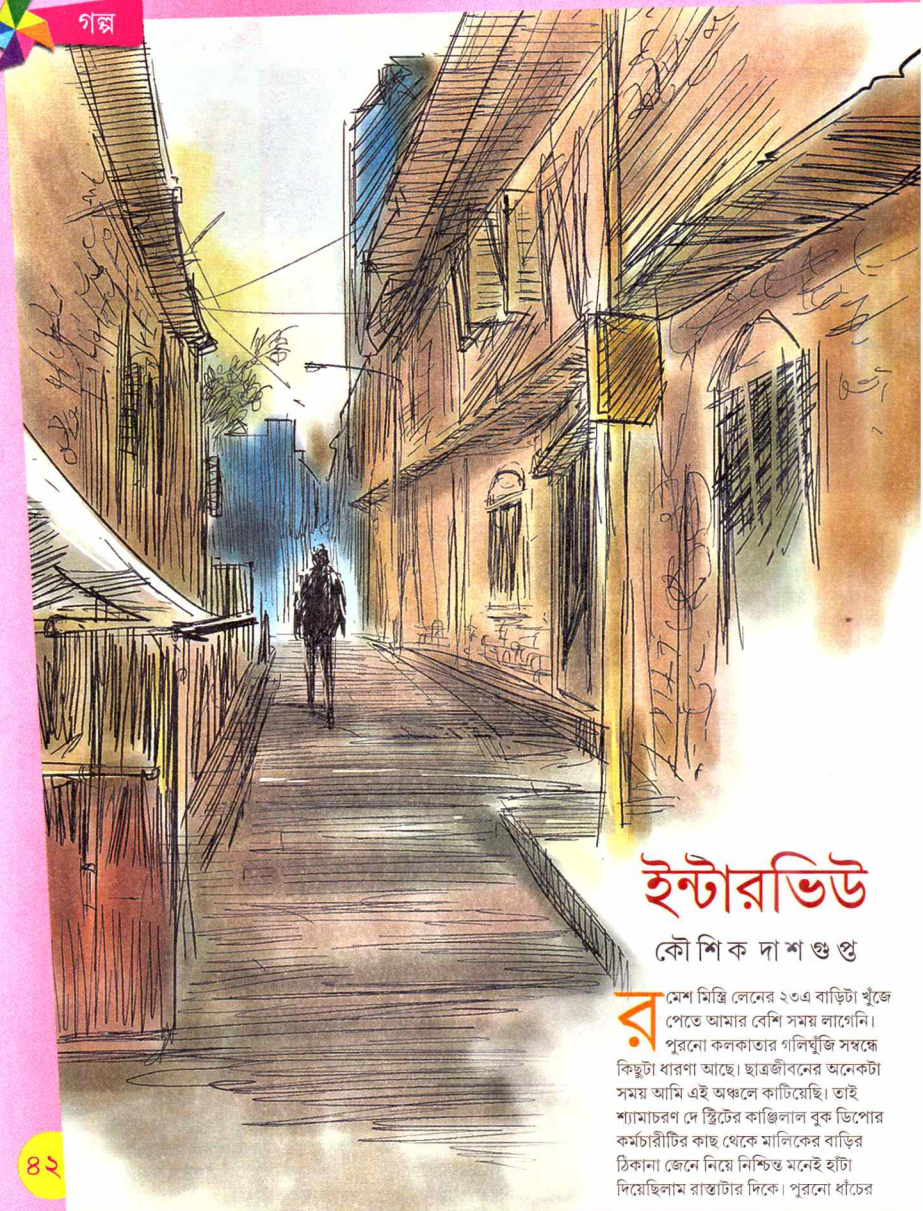

ইন্টারভিউ

কৌশিক দাশগুপ্ত

রমেশ মিস্ত্রি লেনের ২৩এ বাড়িটা খুঁজে পেতে আমার বেশি সময় লাগেনি। পুরনো কলকাতার গলিঘুঁজি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আছে। ছাত্রজীবনের অনেকটা সময় আমি এই অঞ্চলে কাটিয়েছি। তাই শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের কাঞ্জিলাল বুক ডিপোর কর্মচারীটির কাছ থেকে মালিকের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনেই হাঁটা দিয়েছিলাম রাস্তাটার দিকে। পুরনো ধাঁচের

দোতলা বাড়ি। নতুন করে দেওয়ালে রং চড়েছে। চড়া সবুজ রংয়ের কাঠের দরজায় পুরনো নেমপ্লেটে গৃহকর্তার নাম ও বাড়ির নম্বর লেখা। বাড়ির প্রাচীনতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দরজার পাশে একটা ডোরবেলের সুইচ ছিল বটে, তবে সেটা অকেজো। বেশ কয়েকবার কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে যিনি এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে আমি ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলাম।

সেই একই রকম লম্বাটে মুখ, বাজপাখির ঠোঁটের মতো নাক, উঁচু হনু আর একজোড়া তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী চোখ। নতুন যেটুকু নজরে পড়ল, তা হল এই ভদ্রলোকের মাথাভর্তি ঘন কাঁচা-পাকা চুল, ব্যাকব্রাশ করা। আর চোখে মোটা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ।

"কাকে চাইছেন?"

ব্যারিটোন স্বরে প্রশ্ন ধেয়ে এল আমার দিকে।

"অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। এটা কি কাঞ্জিলালবাবু, মানে..."

"আমি কার্তিক কাঞ্জিলাল। নমস্কার।"

অসম্ভব ব্যক্তিত্ব লোকটার। আমি প্রতিনমস্কার করে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বললাম, "একটা বিশেষ ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। দোকান থেকে ঠিকানাটা পেয়েছি।"

"ভিতরে আসুন।"

আধো অন্ধকার প্যাসেজ পেরিয়ে ডানদিকে কার্তিকবাবুর ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলাম। পুরনো আমলের আসবাব। একদিকে রাইটিং ডেস্ক ও চেয়ার। সবচেয়ে নজরকাড়া যেটা চোখে পড়ল তা হল, ঘরের তিনদিকের দেওয়াল জুড়ে মস্ত-মস্ত বুককেস, আর সেগুলোয় ঠাসাঠাসি করে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত হরেক বিষয়ের বই।

"বইগুলো কি সব আপনারই সংগ্রহ?"

"কী জন্যে দেখা করতে এসেছেন বলুন।"

বইয়ের বহর দেখে আমার মুখ ফসকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গিয়েছিল। বুঝলাম ভদ্রলোক অপ্রয়োজনীয় কথা পছন্দ করেন না। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "ইয়ে, মানে একজনের অনুরোধে আপনাকে একটা জিনিস দিতে এসেছি।"

কথা বলতে-বলতে আমি ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়ানো ঘড়িটা বাড়িয়ে ধরি। ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কী এটা?"

"আপনি খুলে দেখুন চিনতে পারেন কি না।"

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে আমার হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে খুললেন। হাতঘড়িটা দেখার পর ওঁর মুখ-চোখের ভাব একেবারেই বদলে গেল। অভিব্যক্তি গোপন না করেই বললেন, "এটা আপনি কোথায় পেলেন?"

এই প্রশ্নের উত্তর আমি তৈরি করেই এসেছিলাম।

"কিছুদিন আগে গণেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দার্জিলিংয়ে। কোনও হোটেলে জায়গা না পেয়ে একটা গেস্টহাউসে ডরমিটরি শেয়ার করতে হয়েছিল আমাদের দু'জনকে। উনি আমার একদিন আগে চেক আউট করেন। যাওয়ার সময় তাড়াহুড়োয় ঘড়িটা ফেলে গিয়েছিলেন। পরে মনে পড়ায় ম্যানেজারকে ফোন করে ঘড়িটার কথা জানান, আর অনুরোধ করেন আমি যেন ওটা সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে এসে আপনার কাছে দিয়ে দিই। আপনি তো গণেশবাবুর দাদা, তাই না?"

আমার কথা শুনে ভদ্রলোকের দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল। অনেক কষ্টে ঠোঁটে একটা হালকা হাসির ভাব ফুটিয়ে বললেন, "আমি তাকে সহোদর বলে পরিচয় দিতে আজও লজ্জা বোধ করি। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহু আগেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এতদিন পর ওর হঠাৎ এটা ফেরত দেওয়ার কথা মনে হল কেন, সেটাই আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকছে। আচ্ছা, ঠিক কবে আপনার সঙ্গে ওর মোলাকাত হয়েছিল?"

মোক্ষম প্রশ্ন। এ প্রশ্নটাও যে আসতে পারে, সেটাও আমি আগে আন্দাজ করেছিলাম। তাই তৈরিই ছিলাম।

"তা হয়ে গেল প্রায় হপ্তাদুয়েক। জানুয়ারির সাত আর আট তারিখ উনি গেস্টহাউসে ছিলেন। ন'তারিখ সকালে চলে যান।"

"তার মানে দুর্ঘটনাটা ঘটার আগে ও দার্জিলিংয়ে ছিল। কোন মতলবে কে জানে!"

"কীসের দুর্ঘটনা?"

আমি কিছু না-জানার ভান করে প্রশ্ন করি। ভদ্রলোক আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকেন। ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তি বোধ করলেও চোখ সরাই না।

"গত সপ্তাহে একটা দুর্ঘটনায় গণেশ মারা গেছে।"

"সে কী! কবে? কোথায়?"

"মৃত্যুর সঠিক তারিখ ও সময় এখনও জানা যায়নি। গত এগারো তারিখ কালিম্পংয়ের কাছে একটা খাদ থেকে ওর মৃতদেহ পাওয়া যায়। সঙ্গে উদ্ধার হওয়া ব্যাগ থেকে বেশ কিছু টাকা আর একটা নোটবুক পাওয়া গিয়েছে। তারই সূত্র ধরে অনেক জায়গায় খোঁজখবর করে পুলিশ অবশেষে এই বাড়ির সন্ধান পেয়ে আমার কাছে আসে। তাদের অনুমান এটা নিছক দুর্ঘটনা না-ও হতে পারে।"

"পুলিশ কি অন্য কোনও সম্ভাবনার কথা ভাবছে? ইয়ে, মানে খুনটুন?"

"হতেই পারে। যে পথে ও চলে গিয়েছিল, তাতে এমন পরিণতির কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আমাদের পরিবারের কাছে যে বহুকাল

আগেই মৃত, সে দুর্ঘটনায় মরল না খুন হল, তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।"

"আপনি কি মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন?"

ভদ্রলোক আবার সেই একই রকম ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বুঝলাম মনে-মনে বিরক্ত হয়েছেন।

কালিম্পং থানার পুলিশ কতগুলো ফোটো এনেছিল। সেগুলো দেখে যা বলার বলে দিয়েছি। অত দূরে গিয়ে

পচাগলা লাশ দেখে শনাক্ত করার কোনও প্রশ্নই আসে না। তা ছাড়া পুলিশ যখন তার পরিচয় পেয়েই গিয়েছে, তখন খামোখা আত্মীয়স্বজনদের টানাটানি করার প্রয়োজন কী!"

"আজ্ঞে?"

"ডুয়ার্সের পুলিশের খাতায় গণেশের নাম অনেকদিন ধরেই লেখা হয়ে আছে, ওয়ান্টেড লিস্টে।"

॥ ২ ॥

আমার মনে হয় কাহিনিটা প্রথম থেকেই শুরু করা ভাল। তা হলে ঘটনাপরম্পরা মিলিয়ে পুরোটা বুঝে নিতে সুবিধে হয়।

যে সময়ের কথা বলছি, সেটা আজ থেকে প্রায় তিরিশবছর আগের। তখন আমি সদ্য এম এ পাশ করে চাকরিবাকরির চেষ্টায় আছি। হোটেল ছেড়ে গড়িয়ার কাছে একটা মেসে বাসা নিয়েছি। কয়েকটা টিউশন আর লেখালিখি করে নিজেরটা মোটামুটি চলে যায়।

লেখার ঝোঁকটা স্কুলজীবন থেকেই ছিল। দু'-একটা প্রথম শ্রেণির পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়ে একটু নামডাকও হয়েছে। গল্পের সংকলনও বেরিয়েছে একটা। তবে কলমবাজির পারিশ্রমিকে তো আর পেট চলে না। তাই টিউশন করতে হত। পাশাপাশি চাকরির চেষ্টা।

স্টেটসম্যান কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দার্জিলিংয়ের একটা মিশনারি স্কুলে মাস্টারির চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। তারই উত্তরে ইন্টারভিউয়ের ডাক পেলাম একদিন।

ইউনিভার্সিটিতে আমার সিনিয়র বিপুল দত্ত বছরখানেক আগে দার্জিলিংয়ের সরকারি কলেজে পড়ানোর চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। নিয়মিত না হলেও আমার সঙ্গে মোটামুটি যোগাযোগ ছিল লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখালিখির সূত্রে। ওকে ফোন করে ব্যাপারটা বলতে বেজায় খুশি হল। ওদের তখন শীতের ছুটি চলছিল। বলল, সরাসরি যেন ওর বাসাতেই গিয়ে উঠি। স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই আমাকে দার্জিলিং দেখানোর দায়িত্বটাও নিয়ে নিল। সেই সঙ্গে একটা শর্তও দিল। ওখানে বাঙালিদের একটা সাহিত্যবাসর তৈরি হয়েছিল মূলত ওরই উদ্যোগে। সেই সাহিত্যবাসরের বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমাকে স্বরচিত গল্প পড়তে হবে এই কড়ারে ও আমার হোস্টের দায়িত্ব পালন করবে। মনে-মনে খুশিই হলাম। রথ দেখা, কলা বেচা দুটোই হবে। সেই সঙ্গে উপরি পাওনা দার্জিলিং বেড়ানো। মন্দ কী?

অনেক লোকজনই এসেছিল। তাদের কেউ-কেউ আবার অটোগ্রাফও নিয়ে গেল নতুন কেনা আমার গল্প সংকলনের পাতায়। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কলকাতায় কেউ তেমন একটা পাত্তা দেয় না। ফুরফুরে মেজাজে গল্প শোনালাম সবাইকে।

সময় হাতে রেখে দিনদুয়েকের জন্য মেদিনীপুর যেতে হল। বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় পোশাক ও জিনিসপত্র নিতে হবে। প্রথমবার পাহাড়ে যাচ্ছি শুনে ডাক্তারকাকু, মানে বাবার বন্ধু ডাঃ অলক বেরা বেশ কিছু হেল্‌থ টিপ্‌স দিলেন। বললেন, ওখানে কেভেন্টার্সের হট চকোলেট আর গ্লেনারিক্সে অন্তত একটা ডিনার যেন অবশ্যই ট্রাই করি। কলকাতায় পার্কস্ট্রিট-চৌরঙ্গি অঞ্চল যেমন কলোনিয়াল কালচারের একটা দিক এখনও ধরে রেখেছে, দার্জিলিংয়েও তার আর-একরকম ফ্লেভার পাওয়া যায়।

এই অলককাকু সম্বন্ধে কিছু কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন। উনি অফিশিয়ালি বাবার বন্ধু হলেও আসলে আমাদের পরিবারের সকলের বন্ধু, বিশেষ করে ছোটদের। ডাক্তারির চেয়ে বেশি ভালবাসেন আড্ডা দিতে আর দারুণ সব অভিজ্ঞতার গল্প শোনাতে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে প্রবল অনুরাগ। দুর্দান্ত ফোটোগ্রাফির হাত। সেই সঙ্গে ব্রিজ আর ব্ল্যাক কফির নেশা। আমাদের ছোটবেলায় তিনিই ছিলেন সেই সান্তাক্লজ, যিনি অসুখেবিসুখে সাবু-বার্লির পথ্য তুলে দিয়ে পেট ভরে মাছ-ভাত খাওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। অলককাকুর বাড়িতেই আমি প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ডে লালকমল-নীলকমল আর বুদ্ধু ভুতুম শুনেছিলাম। তিনিই আমাকে চিনিয়েছিলেন পরশুরাম আর মুজতবা আলিকে। কাজেই তাঁর উপদেশগুলো মাথায় নিয়ে দার্জিলিং যাওয়ার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করলাম।

ইন্টারভিউয়ের তারিখ ছিল ১১ জানুয়ারি। সেই মতো ন'তারিখে কামরূপ এক্সপ্রেসে রওনা দিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে দার্জিলিং পৌঁছতে পরদিন দুপুর গড়িয়ে গেল। বিপুলদা এসে ওর হ্যাপিভ্যালির বাসায় নিয়ে গেল। দুপুরের খাওয়া সেরে টানা ঘুম দিলাম সন্ধে পর্যন্ত। সেদিন আর কোথাও বেরোইনি। ঠান্ডাও ছিল জবরদস্ত।

পরদিন সকালে হিমালয়ের সুচফোটানো হাওয়ায় কাঁপতে-কাঁপতে ইন্টারভিউ দিতে গেলাম। সেটা একরকম হল বটে। ঝকঝকে স্মার্ট আর ঝরঝরে ইংরেজি-বলিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দেখে একটু দমেই গেলাম যেন।

তবে সন্ধেবেলায় ভানুভক্ত হলে সাহিত্যবাসরের বিশেষ অনুষ্ঠান বেশ জমে গেল। বুঝলাম বিপুলদা চেষ্টার খামতি রাখেনি। অনেক লোকজনই এসেছিল। তাদের কেউ-কেউ আবার অটোগ্রাফও নিয়ে গেল নতুন কেনা আমার গল্প সংকলনের পাতায়। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কলকাতায় কেউ তেমন একটা পাত্তা দেয় না। ফুরফুরে মেজাজে গল্প শোনালাম সবাইকে।

কিন্তু আমাকে হতাশ করল দার্জিলিংয়ের পরিবেশ। দীর্ঘ অশান্তির আগুনে পুড়ে পাহাড়ে তখন সবে শান্তি ফিরেছে। আর সেই কারণেই অসময়েও টুরিস্টদের ভিড়ে থিকথিক করছে শহর। একে তো হাড়কাঁপানো শীত আর কুয়াশা। বেলা বারোটার আগে সূর্যের মুখ দেখা যায় না। তার উপরে জলের তীব্র হাহাকার। এর মাঝে বরফ দেখার হুজুগে মেতে গুচ্ছের টুরিস্ট এসে জুটেছে। রাস্তাঘাটে গাড়ি, ডিজেল পোড়া ধোঁয়া, আবর্জনা আর ঘোড়ার মলমূত্রের গন্ধে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। ম্যালে মেলার

মতো ভিড়। খুবই বিরক্তিকর অবস্থা। ভাল লাগছিল না মোটেই। তাই আমার ভ্রমণসারণি সংক্ষিপ্ত করে কেভেন্টার্স, গ্লেনারিজ় আর টাইগার হিলের মায়া কাটিয়ে ১৩ তারিখেই ফিরে আসব মনস্থ করলাম।

আমার কথা শুনে বিপুলদা হাঁইমাই করে উঠল। কিন্তু আমার জেদের কাছে ওকে হার মানতে হল। আবার কোনও এক সময়ে আসব কথা দিয়ে ১৩ তারিখ সকালে পাহাড় ছাড়লাম।

ফেরার রিজ়ার্ভেশন ছিল না। বিপুলদাই শিলিগুড়িতে কোনও এক পরিচিত রেলকর্মীকে ফোন করে দার্জিলিং মেলে একটা ব্যবস্থা করে দিতে বলল। ব্যবস্থা যেটা হল, সেটা জেনারেল কম্পার্টমেন্টে একটা সিট। দালালকে কুড়ি টাকা দিতে হল তার জন্য। আমার অবশ্য তেমন কোনও অসুবিধে হবে বলে মনে হল না। একটা রাতের মামলা। তখন আমি ফিরতে পারলে বাঁচি।

॥ ৩ ॥

সেই রাতে কামরায় বেজায় ভিড়। বেশির ভাগই হিন্দুস্তানি দেহাতি লোকজন। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে কোথায় যেন চলেছে সব। এই অবস্থায় ঘুমটুম অসম্ভব ভেবে ব্যাগ থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক সমগ্র' বের করে পড়তে শুরু করলাম। কখন কিষাণগঞ্জ চলে এসেছে বুঝতে পারিনি। খেয়াল হল যাত্রীদের হুড়োহুড়ি করে নামার বহর দেখে। শুনলাম মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে এরা সবাই দেশগাঁওয়ে ফিরছে। কিষাণগঞ্জ থেকে কাটিহার-ভাগলপুরের ট্রেন ধরবে। এবার একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসার জায়গা পাওয়া গেল।

বইটা পড়তে-পড়তে কখন যেন চোখ লেগে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙতে দেখি ট্রেন মালদা টাউন স্টেশনে দাঁড়িয়ে। কামরা একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবল প্ল্যাটফর্মের দিকে ঘন কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দুটো ঝাপসা বাতি দেখা যাচ্ছে। কামরায় আশপাশে আর কেউ আছে কিনা বুঝলাম না। তবে দু'-একবার মনে হল যেন কাশি আর গলা ঝাড়ার আওয়াজ পেলাম।

ট্রেন আবার ঢিমে তালে গড়াতে শুরু করল। ঘড়িতে রাত প্রায় আড়াইটে। বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি বলে আর ঘুম আসছিল না। কামরার বেশির ভাগ বাতিই অকেজো। যে-ক'টা জ্বলছিল তাদের টিমটিমে আলোয় পড়তে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। ফাঁকা বেঞ্চে এই সুযোগে একটু গড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে ভেবে ব্যাগ থেকে বেডশিট আর হাওয়া-বালিশ বের করে ফেললাম। ঘুম না হোক, শরীরটা তো বিশ্রাম পাক। এমন সময় হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, "কোনও ভদ্রলোকের এখন আর দার্জিলিং যাওয়া উচিত নয়, বুঝেছেন।"

চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি একটু দূরে বাঁদিকের জানলার ধারে আধো অন্ধকারে কেউ একজন বসে আছে। আগে তো চোখে পড়েনি! চেহারাটা স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। কাছাকাছি যেহেতু আর কেউ ছিল না, বুঝলাম কথাগুলো ওদিক থেকেই এসেছে।

"আমায় কি কিছু বললেন?" প্রশ্নটা হাওয়ায় ছুড়ে দিয়ে চাদর বিছোতে শুরু করি।

"আলবাত আপনাকে বলেছি! আপনি ছাড়া এই কামরায় জীবিত ব্যক্তি আর কে আছে যে, তাকে বলব?"

অদ্ভুত বেয়াড়া কথাবার্তা তো! গলাটাও কেমন যেন ফ্যাঁসফেঁসে, ধরা-ধরা।

তবু ভাল, বাকি রাতটার জন্য একজন সহযাত্রী অন্তত পাওয়া গেল।

কিন্তু লোকটা হঠাৎ দার্জিলিংয়ের কথা তুলল কেন? হতে পারে ট্রেনটা যেহেতু দার্জিলিং মেল, ও ধরেই নিয়েছে আমি দার্জিলিং থেকে ফিরছি। ও নিজেও হয়তো তাই।

এইসব ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে জানালার শাটারগুলো লক করলাম। এই সময় একটু চা পাওয়া গেলে ভাল হত।

"এসব জায়গায় মোশাই, রাত্তিরে ট্রেনে চাওয়ালা ওঠে না। চা খেতে চাইলে সেই এক্কেবারে বোলপুর।"

আবার চমকে উঠলাম আমি। বলে কী লোকটা! আমার মনের কথাগুলো পড়ে নিয়েই যেন ও এসব বলছে। একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। বুজরুকরা অনেক সময় সম্ভাব্য শিকারের উপর এইভাবে মানসিক চাপ তৈরি করে।

আর দু'-চারটে এলোমেলো কথাবার্তার পর ব্যাগ থেকে খবরের কাগজ বের করে পড়তে শুরু করেছি, লোকটা হঠাৎ ওর সিট ছেড়ে উঠে এসে আমার উলটোদিকে কোনাকুনি বসল। বেশ লম্বা চেহারা। পাঁচ এগারো হবে। ছিপছিপে গড়ন, বাজপাখির ঠোঁটের মতো নাক। হনু দুটো বেশ উঁচু, যার ফলে চোখের গর্ত গভীর, আর সেখান থেকে টুনিবালবের মতো একজোড়া চোখ উঁকি দিচ্ছে। পরনে সাধারণ উইন্ডচিটার আর ট্রাউজ়ার্স। কানে-মাথায় মাফলার প্যাঁচানো। তার উপরে আবার একটা গোর্খা ক্যাপ।

কাগজটা আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল আগেই। সেটা বুঝেই কিনা কে জানে, লোকটা একবার কাগজটা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করল। আপত্তি করার কোনও কারণ নেই, কাগজটা তাই ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর হাত আমার হাত ছুঁয়ে গেল। হিমঠান্ডা সেই স্পর্শে আমার সারা শরীরে যেন শিহরণ খেলে গেল। সাবলীল হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, "হাতটা যে ঠান্ডায় একেবারে জমে গিয়েছে দেখছি।"

"স্বাভাবিক। পাশের জানলাটা খোলা রেখেছিলাম কিনা। আমার আবার একটু ইয়ে আছে, ওই যে কী বলে যেন, ক্লস্ট্রোফোবিয়া। মুক্ত বিহঙ্গ তো, তাই বন্ধ জায়গায় দমবন্ধ হয়ে আসে। তা, দার্জিলিং কেমন দেখলেন?"

"কী করে বুঝলেন আমি দার্জিলিং গিয়েছিলাম?"

"আন্দাজ করেছি। আমার লাইনে অনেক কিছুই আন্দাজের উপর বাজি ধরতে হয়।"

"লাইনটা কী?"

"করি তো অনেক কিছুই। মানে করতাম।"

"এখন কি করেন না?"

"তা একরকম বলতে পারেন। অবসরে যেতে বাধ্য হলাম হঠাৎ। সে যাক গে, দার্জিলিংয়ে কি বেড়াতে এসেছিলেন না অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল?"

নিঃসন্দেহে লোকটা বেশ গায়েপড়া আর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কৌতূহলী। ভণিতা না করেই বললাম, "চাকরির ইন্টারভিউ ছিল। সেই সঙ্গে একটা সাহিত্যসভায় আমন্ত্রণ। দুটো কাজই হল।"

"সাহিত্যসভা! বেড়ে ব্যাপার তো

মশাই! আপনার কি সাহিত্যটাহিত্যও করা হয়?"

"তেমন কিছু নয়, একটু লেখালিখির শখ আছে।"

"কী লেখেন আপনি?"

"গল্প।"

"বাহ, বাহ! তা কীরকম গল্প? মানে কী বিষয়ে?"

"বিষয় তো অনেক রকম হতে পারে। আমি মূলত রহস্য-রোমাঞ্চ আর গোয়েন্দাকাহিনি লিখে থাকি।"

"চমৎকার! চমৎকার! স্বপন কুমার পড়েছেন? কালনাগিনী সিরিজ? আমি তো মোশাই, স্কুললাইফে ওই বইগুলোই বেশি পড়েছি। আর তাতেই মাথাটা বিগড়োল। বুদ্ধিসুদ্ধি খারাপ ছিল না। তবে দুর্বুদ্ধিই বেশি। সবসময় মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করত নানা রকম ছক। দীপক চাটুজ্যের মতো দুঁদে গোয়েন্দার পক্ষেও সেসব ধরা সম্ভব ছিল না। ঠিক যেমন কালনাগিনী। ধরা পড়েও পড়ত না। আমাকেও ধরতে পারেনি। তবে কী জানেন মোশাই, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ভাল নয়। সেটাই আমার কাল হল। শেষমেশ নিজের লোকগুলোই কিনা... আসলে এসবই হচ্ছে নিয়তি। আগে থেকে সব লেখা হয়ে থাকে, বুঝলেন।"

"না, কিছুই বুঝলাম না।"

"সে অনেক কথা, সময় পেলে বলব'খন। আচ্ছা, আপনি ভূতের গল্পো লেখেন না? ওই অশরীরী আত্মাটাত্মা নিয়ে?"

"অলৌকিক ব্যাপারে আমার তেমন একটা আগ্রহ নেই।"

"কেন? আপনি কি ওসবে বিশ্বাস করেন না?"

"বিশ্বাসের ব্যাপারটা নির্ভর করে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার উপর। অনেকেই এসবে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু উপভোগ করেন। এই ব্যাপারটাকে সাহিত্যের ভাষায় বলা হয় 'উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ'। আমার গল্পগুলো রহস্যকাহিনি হলেও যুক্তিনির্ভর। বলতে পারেন একরকমের মিস্ট্রি সল্‌ভিং। তা ছাড়াও আজ পর্যন্ত সেরকম কোনও অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে আমার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও হয়নি। হলে, অবশ্যই তার বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম। তারপর লেখার কথা ভাবতাম।"

"বয়সটা কাঁচা তো, তাই অভিজ্ঞতাটাও কম। ধরুন, আমি যদি আপনাকে আমার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলি, আপনি লিখবেন আপনার গপ্পো?"

পাহাড় থেকে পড়ে পর্যটকের মৃত্যু। খবরে যা লেখা ছিল তার মোদ্দা কথা, কালিম্পং থেকে কিছু দূরে চুইখিম নামে একটা নির্জন পাহাড়ি গ্রামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। প্রায় পাঁচশো ফুট গভীর খাদ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়।

হাবভাবে এবং কথাবার্তায় একটু বেখাপ্পা ধরনের হলেও লোকটা ইন্টারেস্টিং। একটু ছিটগ্রস্ত, অথবা কোনও ধুরন্ধর বদমাইশ। আমাকে এখন কোনওরকমে ঠেকা দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। যদি না তার আগে কোনও বড় বিপদ নেমে আসে। কাজেই ওর কথা শোনাই ভাল।

আমার সম্মতি পেয়ে লোকটা আমার খবরের কাগজটা একবিন্দুও না পড়ে আমাকে ফেরত দিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে নিজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলয়েড মাপের কাগজ বের করে আনল। দেখলাম সেটা উত্তরবঙ্গের একটা খবরের কাগজের সান্ধ্য এডিশন। ১৩ তারিখের।

"এই যে, এইখানটায় দেখুন। একটা দুর্ঘটনার খবর বেরিয়েছে, পড়ুন।"

দেখলাম বাঁদিকের কলামের মাঝামাঝি ছোট হেডলাইন: পাহাড় থেকে পড়ে পর্যটকের মৃত্যু। খবরে যা লেখা ছিল তার মোদ্দা কথা, কালিম্পং থেকে কিছু দূরে চুইখিম নামে একটা নির্জন পাহাড়ি গ্রামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। প্রায় পাঁচশো ফুট গভীর খাদ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। অনুমান যে, তিনি ওই গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন এবং পাহাড় থেকে পড়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

আমি কৌতূহলী চোখে লোকটার দিকে তাকালাম। এই খবরটার মধ্যে কী এমন রহস্য বা অলৌকিক বিষয় আছে যে আমাকে দেখাতে হবে? ও যেন আমার প্রশ্নটা পড়ে নিয়েই বলে উঠল, "এটা খালি চোখে দুর্ঘটনা মনে হলেও আসলে তা নয়। এটা খুন।"

"সেটা আপনি বলছেন কীসের ভিত্তিতে, যেখানে পুলিশ এখনও তদন্ত শেষ করেনি?"

"পুলিশ তদন্ত করে কিছুই বের করতে পারবে না। কারণ, আততায়ীরা কোনও প্রমাণ রেখে যায়নি। আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে রহস্যটা খুঁজে বের করে আপনার গপ্পো লিখুন। অপরাধী ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, আপনার গপ্পো পড়ে কিছু মানুষ অন্তত বুঝবে, চোখের দেখা আর প্রকৃত সত্য সবসময় এক হয় না।"

"আমি কীভাবে এই রহস্য খুঁজে বের করব? আমি এ বিষয়ে জানিটা কী?"

"আমি যা-যা বলছি সেটা নোট করে নিন।"

ওর কথা শোনা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখলাম না। সকাল হতে আর কত বাকি কে জানে!

"যে লোকটা খুন হয়েছে তার নাম হল গণেশ কাঞ্জিলাল।"

"কাগজে তো কই, নাম দেখলাম না।"

"খবরের কাগজওয়ালারা নাম জানতে পারেনি, তাই ছাপেনি। তবে পুলিশ এতক্ষণে নিশ্চয়ই পরিচয় বের করে ফেলেছে।"

"আর?"

"লোকটা নানা রকম অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।"

"কিন্তু আপনি এসব জানলেন কী করে?"

আমার প্রশ্ন শুনে লোকটার মুখে একটা করুণ হাসি খেলে গেল।

"এসব খবর আমার চেয়ে বেশি আর কারও পক্ষেই জানা সম্ভব নয়, কারণ..."

হুইস্‌ল বাজিয়ে প্রচণ্ড গতিতে একটা আপ লাইনের ট্রেন পাশ দিয়ে পেরিয়ে

যাচ্ছিল। সেই শব্দে লোকটার কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

সেই ট্রেনের কামরাগুলোর আলো ছিটকে আসছিল আমাদের কামরায়। দেখলাম লোকটা দু'চোখে হাত চাপা দিয়ে বসে আছে। এরপর আবার সেই আধো অন্ধকার কামরা। রাতের জমাট বাঁধা কুয়াশা আর অন্ধকার ভেদ করে আমাদের ট্রেনের দুলকি চালে চলার একটানা শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

আমি অপেক্ষা করছিলাম লোকটার বাকি কথাগুলো শুনব বলে। কৌতূহল যে হচ্ছিল না, তা নয়।

এর মধ্যে লোকটা হঠাৎ উঠে পড়ে প্যাসেজের দিকের একটা জানলার শাটার তুলে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। খোলা জানলা দিয়ে হিমঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে কাঁপিয়ে দিল আমাকে। শাটার নামিয়ে লোকটা ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, "আমার নেমে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। রাত শেষ হয়ে আসছে কিনা। আপনাকে সবটা বলা হল না। সে যাক গে, তবে আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে, সেটা কিন্তু রাখতে হবে আপনাকে।"

মরেছে! টাকা-পয়সা চেয়ে বসবে নাকি?

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা ফের ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল, "আপনার কাছে একটা কলম হবে?"

লোকটার প্রস্তাব শোনার আগ্রহ চেপে রেখে শার্টের বুকপকেট থেকে বিপুলদার থেকে উপহারে পাওয়া, একটা ঝকঝকে নতুন বেশ দামি কলম বের করে এগিয়ে দিলাম। লোকটা সেটা নিয়ে নিজের বাঁহাত থেকে রিস্টওয়াচটা খুলে ওর হাতের খবরের কাগজটায় কলম দিয়ে কিছু একটা লিখল। তারপর কাগজ দিয়ে রিস্টওয়াচটা ভাল করে মুড়ে আমার হাতে প্রায় জোর করে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই ঘড়িটা কলকাতায় একজনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কাগজের গায়ে ঠিকানাও লিখে দিয়েছি। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কাঞ্জিলাল বুক ডিপোর মালিক। নাম কার্তিক কাঞ্জিলাল।"

হঠাৎ এরকম একটা বেমক্কা আবদারে থতমত খেয়ে গেলাম। 'অন্য কোনও মতলব নাকি?'

"আপনি যেন ভাববেন না এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। খুবই সোজাসাপ্টা ব্যাপার। এই ঘড়ির আসল মালিক উনিই। ফেরত পেয়ে খুশি হবেন অবশ্যই। আপনি শুধু দয়া করে এটা পৌঁছে দিলেই হবে। ইয়ে, ওই দোকানটা শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে।"

আমি মরিয়া হয়ে বললাম, "আপনার পরিচয় কী দেব? সেটাই তো এখনও বলেননি। তা ছাড়া, আপনার কাছে ঘড়িটা গেল কীভাবে?"

"ওটা আমি কুড়ি বছর আগে লোভে পড়ে চুরি করেছিলাম। এখন ফেরত দিয়ে একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আর হ্যাঁ, আমার নাম গণেশ কাঞ্জিলাল। আচ্ছা আসি, নমস্কার।"

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই লোকটা তড়িৎ গতিতে দরজার কাছে চলে গেল। তারপর অনায়াসে ভারী পাল্লাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি দৌড়ে দরজার দিকে গেলাম। দেখলাম ট্রেন ধীর গতিতে একটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। সেই সুযোগে লোকটা নেমে গিয়ে ঘন কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে। হাতে কাগজের মোড়কটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সংবিত ফিরল চাওয়ালার হাঁকে।

"কোন স্টেশন ভাই?"

"বোলপুর।"

॥ ৪ ॥

চোদ্দো তারিখ সকালে শিয়ালদায় ট্রেন থেকে নেমে আর মেসে ফিরে যাইনি। সোজা মেদিনীপুর চলে এসেছিলাম।

এই ক'দিনের ধকলেই বেশ কাবু হয়ে গিয়েছিলাম। ঠান্ডাও লেগেছিল। হাওড়া স্টেশন থেকেই টের পাচ্ছিলাম শরীরে জ্বর-জ্বর ভাব। বাড়ি ফিরে একেবারে বিছানা নিলাম।

খবর পেয়ে সন্ধেবেলায় অলককাকু এসে দেখেটেখে ওষুধপত্র লিখে দিলেন। আমি ব্যাপারটা অলককাকুকে বলব কী বলব না ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম। শুনেটুনে তাঁর কপালে মস্ত ভাঁজ পড়ল।

"তুই যে একটা মস্ত বড় বোকামির কাজ করেছিস, সেটা বুঝতে পারছিস তো?"

"ঘড়ির ব্যাপারটা বলছ তো?"

"অবশ্যই।"

"তুমি যতটা সিরিয়াস ভাবছ ততটা নাও হতে পারে।"

"তা হলে আর ভাবনা কীসের?

ঠিকানা খুঁজে ঘড়িটা যথাস্থানে পৌঁছে দে। তবে মনে রাখিস ঘড়িটার মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে, যা তোর হাত দিয়ে পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।"

"তুমি কি সেই লালমোহনবাবুর হাত দিয়ে নওলাখা হার পাচার হওয়ার কথা ভাবছ?"

"অসম্ভব নয়।"

"একটা ছোট হাতঘড়ির মধ্যে কি এমন মূল্যবান জিনিস পাচারের জন্য লোকটা এত কষ্ট করবে?"

"হয়তো ঘড়িটা ইটসেল্ফ খুব মূল্যবান। অ্যান্টিক পিস, কিংবা ওটার সঙ্গে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। দেখা দেখি একবার ঘড়িটা।"

আমি ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া ঘড়িটা বের করে অলককাকুর হাতে দিলাম। ব্রু কফিতে চুমুক দিয়ে উনি ঘড়িটা খুব ভাল করে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "কস্টলি ওয়াচ, নো ডাউট। হাজারতিনেকের কম নয়। খোদ সুইটজারল্যান্ডের প্রডাক্ট। তবে নট মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড। মনে হচ্ছে এটা সিম্পল কেস।"

"সে নয় বুঝলাম। কিন্তু আমাকে ভাবাচ্ছে অন্য বিষয়," আমি খবরের কাগজটা নিয়ে অলককাকুর হাতে দিলাম, "যে লোকটা মারা যাওয়ার খবর ১৩ জানুয়ারি সন্ধের কাগজে বেরল, সেই লোক ওই একই দিন মাঝরাতে ট্রেনে উঠে ঘড়িটা আমাকে দিয়ে গেল কীভাবে?"

"ভেবে নে, মৃত ব্যক্তির অশরীরী আত্মা এসে তোর কাছে ওটা রেখে গিয়েছে।"

এবার আমি হেসে ফেলি, "অশরীরী কেন হবে? দিব্যি লম্বা খাম্বা চেহারা। আমার সঙ্গে কথাও করল বিস্তর। যদিও একটু বেখাপ্পা ধরনের।"

"আমি দুটো সম্ভাবনার কথা ভাবছি।"

"কীরকম?"

"প্রথমত, মৃত ব্যক্তি আর ট্রেনের সহযাত্রী একই লোক নয়। যেহেতু কাগজে কোনও নাম উল্লেখ করেনি, অন্য কোনও লোক খবরটা দেখে বিশেষ কোনও মতলবে সেটা কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল মতলবটা কী?"

"আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা?"

"সেক্ষেত্রেও ধরে নিতে হবে দুটো লোক আলাদা এবং ট্রেনের লোকটা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নয়। ও একটা বিরল মানসিক রোগের শিকার। সাইকায়াট্রির পরিভাষায় এটাকে বলে ওয়াকিং কর্পস ডিলিউশন বা কোটার্ড সিনড্রোম, যা এক ধরনের চরম মানসিক বিভ্রম। এতে

"সে নয় বুঝলাম। কিন্তু আমাকে ভাবাচ্ছে অন্য বিষয়," আমি খবরের কাগজটা নিয়ে অলককাকুর হাতে দিলাম, "যে লোকটা মারা যাওয়ার খবর ১৩ জানুয়ারি সন্ধের কাগজে বেরল, সেই লোক ওই একই দিন মাঝরাতে ট্রেনে উঠে ঘড়িটা আমাকে দিয়ে গেল কীভাবে?"

আক্রান্ত হলে রোগী নিজেকে মৃত বলে মনে করে। লেট নাইন্টিনথ সেঞ্চুরিতে ফরাসি নিউরোলজিস্ট জুলস কোটার্ড এই রোগের উপর প্রথম আলোকপাত করেন।

"এখন যাই হোক না কেন, তোর কাজ হল কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওই ভদ্রলোকের ঠিকানা খুঁজে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘড়িটা ফিরিয়ে দেওয়া।"

"কিন্তু তিনি যদি জানতে চান ঘড়িটা আমি পেলাম কীভাবে? ট্রেনের ঘটনাটা বললে সেটা কি তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে? উলটে আমাকেই পাগল না ভেবে বসেন।"

"বানিয়ে যা হোক একটা কিছু গল্প খাড়া করবি। বলবি দার্জিলিংয়ের হোটেলে আলাপ হয়েছিল। তুই কলকাতায় থাকিস শুনে তোকে অনুরোধ করেছিল ঘড়িটা ওই ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। তবে খেয়াল রাখিস, ওই আলাপের তারিখটা যেন ১৩ জানুয়ারির বেশ কয়েকদিন আগের হয়।"

"আর যদি কার্তিক কাঞ্জিলাল নাম আদৌ কাউকে খুঁজে না পাই?"

"সেক্ষেত্রেও ট্রেনের লোকটাকে পাগল বলে ধরে নেওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা দেখছি না। তখন না হয় ঘড়িটা আমাকে উপহার দিয়ে দিস।"

॥ ৫ ॥

অলককাকুর সঙ্গে ঘটনাটা আলোচনা করে একটু হালকা বোধ করলাম। কলকাতায় ফিরে প্রথম যেটা করলাম তা হল মেসের ম্যানেজার জীবনবাবুর কাছ থেকে টেলিফোন ডিরেক্টরি চেয়ে নিয়ে কার্তিক কাঞ্জিলালের খোঁজ করা।

সেদিন সন্ধেয় কার্তিকবাবুর কাছ থেকে তাঁর ভাইয়ের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পেরেছিলাম। অল্প বয়স থেকেই অসৎ সংসর্গে পড়ে বিগড়ে যায় গণেশ কাঞ্জিলাল। তা নিয়ে বাপের সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকত। একদিন অনেক রাত করে বাড়ি ফেরায় অশান্তি চরমে ওঠে। পরদিন সকাল থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি কার্তিকবাবুর মায়ের বেশ কিছু গয়নাগাটি আর তাঁর শখের রোলেক্স ঘড়িটি।

পারিবারিক সম্মানের কারণে পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের মাধ্যমে খোঁজখবর করা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন পর কানাঘুষোয় শোনা গিয়েছিল সে নাকি ডুয়ার্সের দিকে কোনও এক চা-বাগানে কাজ করছে। এরও প্রায় বছরপাঁচেক পরে একদিন বাড়িতে পুলিশ আসে। হলদিবাড়ির একটা ব্যাঙ্ক জালিয়াতির কেসে পুলিশ তখন গণেশ কাঞ্জিলালকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

এই ঘটনার পর কার্তিকবাবুর বাবা তাঁর এই কুপুত্রটিকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেন। মারাও যান অল্পদিনের মধ্যে। আঘাতটা সহ্য হয়নি তাঁর। বাবার মৃত্যুর পর কার্তিকবাবুই ব্যবসার দায়িত্ব নেন। উন্নতিও করেন। বৃদ্ধা মাকে নিয়ে পৈতৃক বাড়িতেই থাকেন। বিয়ে-থা আর করেননি।

ঘড়িটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত হলাম বটে, কিন্তু আমার আসল প্রশ্নের উত্তর সেই অধরাই থেকে গেল। সেদিন রাতের দার্জিলিং মেলে আমার সহযাত্রীটি তবে কে ছিল? শেষমেশ আমাকেও কি ভূতে বিশ্বাস

করতে হবে? এই ভাবনাটাই তাড়া করে বেড়াচ্ছিল তখন থেকে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করতে কুণ্ঠা বোধ করছিলাম, পাছে ঠাট্টা-তামাশা করে। কাজেই এক অদ্ভুত মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটছিল। লেখাজোখা বন্ধ। মাথায় কিছুই আসছিল না। একবার ভাবলাম এই ঘটনাটা নিয়ে কিছু একটা লিখি। কিন্তু শেষ করব কোথায়?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও টিউশনগুলোয় যেতে হচ্ছিল। একটা চাকরিবাকরি থাকলে ভাল হত। অনেকটা সময় অন্যদিকে ব্যস্ত থাকতে পারতাম। রোজগারের চিন্তাটাও করতে হত না। এভাবেই দিনসাতেক চলল। একদিন রাতে টিউশন সেরে সবে মেসে ফিরেছি, এমন সময় ম্যানেজার জীবনবাবু এসে একগোছা চিঠি দিয়ে গেলেন। ডাকবাক্সে এসে পড়েছিল। তিনটে তিন রকমের খাম। তার মধ্যে একটা ব্রাউন পেপারের খামে দার্জিলিংয়ের সেই স্কুলটার নাম আর লোগো ছাপা। এই খাম আমি চিনি। ইন্টারভিউয়ের চিঠিও এই রকম খামে এসেছিল। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল। চিঠিটা বের করে পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। ওরা রিগ্রেট লেটার পাঠিয়েছে। সেই সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ সাফল্যও কামনা করেছে। এত সুন্দর ভাষায় যে কাউকে প্রত্যাখ্যান করা যায়, সেটা শিখলাম।

পরদিন আর মেসের ঘর থেকে বাইরে পা রাখিনি। সারাদিনই মন খারাপ নিয়ে শুয়েছিলাম। এইভাবেই হয়তো আরও কয়েকদিন চলত, যদি না সেদিন বিকেলে সুরজিৎ এসে একরকম জোর করেই বাইরে নিয়ে যেত।

সুরজিৎ আমাদের মেদিনীপুরেরই ছেলে। আমার খুবই ঘনিষ্ঠ। কলকাতায় কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ত। ও এসে একটা সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে লাগল। বলল লাইট হাউসে জেমস বন্ড-এর ছবি এসেছে। জমাটি ছবি বলে শুনেছে। আমার একটু চেঞ্জের দরকার ছিল। বেরিয়েই পড়লাম ওর সঙ্গে।

॥ ৬ ॥

মৃত ডাব্‌ল-ও-সেভেনের দুর্ধর্ষ অভিযান দেখতে-দেখতে আবার নতুন করে একটা অস্থিরতা পেয়ে বসছিল। মাথার ভিতরে বন্ধ হয়ে থাকা একটা জানলা যেন আস্তে-আস্তে খুলে যাচ্ছিল। আমি উসখুস করছিলাম। তবে কি গণেশ কাঞ্জিলাল...

ইন্টারভ্যালে বাইরে বেরিয়ে সুরজিৎকে বললাম, "তুই ছবিটা দ্যাখ, আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। একটা জরুরি কাজ মনে পড়ে গেল।"

"মানে? খেপেছ নাকি তুমি?"

"হ্যাঁ রে, সত্যিই খেপে গিয়েছি। তোকে পরে সব বলব। আর হ্যাঁ, এই ছবিটা দেখানোর জন্যে তোকে মস্ত বড় একটা থ্যাঙ্কস। আর-একটা ট্রিটও পাওনা রইল তোর।"

সুরজিৎকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, হল থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটা দিলাম মেট্রো স্টেশনের দিকে। তখন টালিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো চলত। ওখান থেকে গড়িয়ার অটো ধরলাম।

আমাদের মেসবাড়িটার দু'-তিনটে ব্লক আগে একটা টেলিফোন বুথ ছিল। সেখানে ঢুকে যে নম্বরটা ডায়াল করলাম সেটা অলককাকুর। রহস্য উদ্‌ঘাটনের উত্তেজনায় আমি তখন ভিতরে-ভিতরে কাঁপছিলাম।

"কী রে? তোর যে সাড়াশব্দই নেই! লোকটা কে, খুঁজে পেলি?"

"হ্যাঁ পেয়েছি, আর ঘড়িটাও দিয়ে এসেছি।"

"সে কি সত্যিই গণেশ কাঞ্জিলালের দাদা?"

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট! চেহারাতেও অনেক মিল। যমজ কিনা।"

"স্ট্রেঞ্জ! তা, কথাবার্তায় কী বুঝলি?"

আমি অলককাকুকে আনুপূর্বিক সবই বললাম।

"তা হলে ওই গণেশ লোকটা সত্যিই মৃত?"

"আদপেই না।"

"মানে?"

"গণেশ যদি ওই দুর্ঘটনায় মারা যেত, তা হলে রাতের দার্জিলিং মেলে আমার অদ্ভুত সহযাত্রীটিকে ভূত বলে মেনে নিতে হয়। যেহেতু সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এই ক'দিন খুব অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছি। বিশেষ করে কার্তিকবাবুর সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার পর থেকে। আজ আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছি।"

"কীরকম?"

"তুমি দুটো সম্ভাবনার কথা বলেছিলে। আমি তৃতীয় একটা সম্ভাবনা খুঁজে বের করেছি এবং সেটাই হয়তো সঠিক।"

"খুলে বল।"

"তোমার অনুমান মতো আমিও মৃত ব্যক্তি আর গণেশকে আলাদা লোক বলেই মনে করি। তুমি বলেছিলে লোকটা মানসিক রুগি হতে পারে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ও আদৌ কোনও রোগের শিকার নয়। যদি হয়, সেটা ওর অপরাধমনস্কতা। লোকটা আসলে একটা খুনি। খুব ঠান্ডা মাথার খুনি।"

"বলে যা, আমি খুব এক্সাইটেড ফিল করছি।"

"গণেশ অন্ধকার জগতের লোক ছিল। পুলিশের খাতায় ওয়ান্টেড ছিল। তাই পুলিশকে আর খুব সম্ভবত ওর পুরনো শাগরেদদের ফাঁকি দেওয়ার ফিকিরে নিজেকে মৃত বলে রটিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা করেছিল। মৃত লোকটা সেই পরিকল্পনার শিকার। তাই লোকটাকে মেরে অথবা অচৈতন্য করে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়ার আগে রীতিমতো ছক কষেই তার সঙ্গে টাকা আর নিজের নোটবুকসহ ব্যাগটাও ফেলে দিয়েছিল। খবরের কাগজওয়ালাদের হয়তো ও-ই খবর দিয়েছিল আড়ালে থেকে।"

"এটা তোর কষ্টকল্পনা হয়ে যাচ্ছে না তো? তুই যে বললি ওর দাদা ছবি দেখে লাশ শনাক্ত করেছে?"

"ট্রেনের কামরায় কয়েক ঘণ্টা একটা লোকের সঙ্গে এত গল্প করার পরেও তাকে ভূত মনে করাটা আরও বড় রকমের কষ্টকল্পনা হয়ে যায়। গণেশের ট্র্যাকরেকর্ড বলছে ও অপরাধী। কাজেই এই অপরাধ ওর পক্ষে করা অসম্ভব নয়। আর বিশ বছর না দেখা ভাইয়ের থেঁতলানো, বাসি মড়ার ছবি দেখে চিনতে পারাটা বেশ কঠিন ব্যাপার। তা ছাড়া ভাইয়ের প্রতি দাদার যে বিতৃষ্ণা দেখলাম, তাতে মনে হল ভাইয়ের মারা যাওয়ার খবরে তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।"

"তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তোর সঙ্গে ওর এই নাটকটা করার মানেটা কী?"

"ফাঁকা ট্রেনের কামরায় আমাকে একা পেয়ে একটা তাৎক্ষণিক সুযোগ নেওয়ার মতলব খেলেছিল ওর মাথায়। হয়তো

ভেবেছিল আমি কার্তিকবাবুর কাছে ঘড়িটা ফেরত দিতে গিয়ে এই অলৌকিক সাক্ষাৎকারের কথা বললে ওর মৃত্যুর খবরটা আরও বেশি চাউর হবে। ভূতের গপ্পো যত ছড়াবে, পরোক্ষে লোকে বিশ্বাস করে নেবে যে গণেশ লোকটা মৃত। মানুষের তো অলৌকিক বিষয়ে আকর্ষণ বেশি, বিশ্বাস করুক বা না করুক।"

"ব্র্যাভো! তা হলে গণেশের ভূত তোর মাথা থেকে নামল?"

"ভূত তো নেমেছে। কিন্তু ভূতের চেয়ে জ্যান্ত মানুষ যে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। সে তো পার পেয়ে গেল। তাই ভাবছিলাম পুলিশকে এ বিষয়ে কিছু..."

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অলককাকু এবার ধমক দিয়ে উঠল, "খবরদার ওসব করতে যাবি না! তাতে অনেক বড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বি। তুই যেটা ভেবেছিস সেটা সঠিক হলেও হতে পারে, কিন্তু অনুমানমাত্র। প্রমাণ নেই তোর কাছে। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে এত বড় ঝুঁকি নেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই। যেসব প্রমাণের উপর নির্ভর করে পুলিশ ভেবেছে গণেশ কাঞ্জিলাল মৃত, সেগুলো সবই পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ। তদন্ত সঠিকভাবে এগোলে আসল সত্য প্রকাশ পাবেই। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। তুই তোর কাজ কর। পুরো অভিজ্ঞতার উপর একটা ভাল গল্প লিখে ফ্যাল। ব্যস, এই পর্যন্তই।"

টেলিফোন বুথে বিল মেটাতে অনেক টাকা বেরিয়ে গেল। অলককাকুর কথায় যুক্তি আছে। সেটা মাথায় রেখে হালকা মেজাজেই মেসে ফিরে এলাম। নতুন গল্পের প্লট ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠছে তখন। পুলিশের হাতে পার পেয়ে গেলেও গণেশ কাঞ্জিলাল আমার গল্পে পার পাবে না। রাতেই শুরু করব লেখা।

মেসে ঢুকতেই জীবনবাবু ভুরুটুরু কুঁচকে বললেন, "কোথায় থাকেন বলুন তো মশাই? প্রকাশকের লোক ফোন করে ব্যতিব্যস্ত করে দিল। আপনাকে কল ব্যাক করতে বলেছে।"

"কোন প্রকাশক? নম্বর দিয়েছে কোনও?"

"ওরা যে কী চিঠি দিয়েছিল আপনাকে? নামটা বর্ণমালা না কী যেন একটা বলল! ফোন নম্বর সেই চিঠিতেই দেওয়া আছে নাকি।"

আমি দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকে প্রথমেই টেবিল হাতড়ে চিঠিদুটো খুঁজে বের করলাম। আগের দিন এ দুটো খুলে দেখা হয়নি। একটা ছোট খামে বসিরহাটের এক পত্রিকা সম্পাদকের চিঠি। ওদের বসন্ত সংখ্যার জন্য লেখা চেয়েছে। অন্য খামটা বেশ বড় আর পুরু। উপরে বর্ণমালা নাম ছাপা। ভিতরে লেটারহেডে টাইপ করা চিঠি। সঙ্গে আর-একটা ছোট সাদা প্যাকেট। মনে হল পকেট ডায়েরিফায়েরি গোছের কিছু আছে। বছরের শুরুর দিকটায় অনেক প্রকাশনা সংস্থার তরফ থেকে এরকম শুভেচ্ছাপত্র ও ছোটখাট উপহার আসে। চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম।

॥ ৭ ॥

'সুজনেষু,

'আমি লেখক অনিকেত গুপ্তর এক গুণমুগ্ধ পাঠক। আপনার প্রায় সব গল্পই আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই গল্প-উপন্যাস পড়ার ঝোঁক ছিল। বিশেষ কারণে বইপত্রের কোনও অভাব হয়নি। এখনও সেই অভ্যেস বজায় আছে। লেখালিখিও একটুআধটু করে থাকি।

'সাম্প্রতিক কালের বাঙালি লেখকদের মধ্যে আপনি আমার বিশেষ প্রিয় এই কারণেই যে, আপনার রহস্যকাহিনিগুলো গতানুগতিক ছকের বাইরে গিয়ে এক নতুন স্বাদের সন্ধান দেয়। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার বাসনা অনেকদিনের। কিন্তু সে সুযোগ সরাসরি পাইনি।

'সম্প্রতি ব্যবসার কাজে দার্জিলিং যেতে হয়েছিল। চকবাজারে একটা নামী বুক স্টোরের ডিসপ্লে বোর্ডে সাঁটা সাহিত্যবাসরের পোস্টারে আপনার নাম দেখে পুলকিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করে আসব। কিন্তু হঠাৎ করেই সর্দি-জ্বরে কাবু হয়ে পড়ায় সেই সন্ধেয় আর বাইরে বেরনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

'ইচ্ছাশক্তি মানুষকে অনেক সময় তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পেতে সময়মতো সহায়তা করে। তাই হয়তো আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার অনিবার্য ছিল।

'এবার একটি অন্য প্রসঙ্গে আসি। বই আমার নেশা ও পেশা। সেই আসক্তি ও বাধ্যতা থেকেই আমার নতুন প্রকাশনা সংস্থা 'বর্ণমালা' থেকে ছোটদের জন্য একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা আগামী বাংলা নববর্ষে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। আপনার মতো তরুণ, শক্তিশালী লেখকের সহযোগিতা ছাড়া এই প্রয়াস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই আমার ধারণা। তাই সংস্থার পক্ষ থেকে পত্রিকাটির গল্প বিভাগের সম্পাদকের দায়িত্বটি গ্রহণ করার জন্য আপনার কাছে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হয়ে যাবে। সেই বিষয়টি পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতেই স্থির করা যেতে পারে।

'আশা করি এই প্রস্তাব বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে আপনার উত্তর জানাবেন। প্রয়োজনে টেলিফোনে যোগাযোগ করবেন।

'আগামী যাত্রাপথে আপনাকে সহযাত্রী হিসেবে পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

'নমস্কারান্তে,

'কার্তিকচন্দ্র কাঞ্জিলাল।

'পুনশ্চ : গল্প বিভাগের সম্পাদকের পদটিতে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে কোনও 'ইন্টারভিউ' দিতে হবে না, কারণ ইতিপূর্বেই আপনি দু'-দু'টি ইন্টারভিউ সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ এই চিঠির সঙ্গে আপনার একটি প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠালাম। ফ্যান্সি মার্কেটে কেনা একশো কুড়ি টাকার রোলেক্স ঘড়ির চেয়ে সেটির দাম নিঃসন্দেহে বেশি। গ্রহণ করে বাধিত করবেন।'

॥ ৮ ॥

আমি যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো খামের ভিতর থেকে প্যাকেটটা বের করে খুললাম। উঁকি মেরে ভিতরে ঝকঝকে নতুন দামি কলমটা একবার দেখেই বুঝে নিতে অসুবিধে হল না, বিপুলদার আমাকে দেওয়া উপহার ফের একবার ফিরে এসেছে তার মালিকের কাছেই।

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

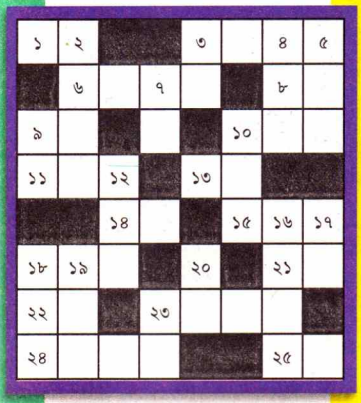

পাশাপাশি

১। হাতি।
৩। বন্যার পর গ্রামগঞ্জের যে অবস্থা হয়।
৬। ওড়িশার প্রধান নদী।
৮। নাটকের স্থান।
৯। ডাল দিয়ে এর তরকারি খুবই উপাদেয়।
১০। স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত ইতালির একটি শহর।
১১। এর সঙ্গে সংশ্লেষ যোগ করলেই গাছের খাবার তৈরির কাজ।
১৩। রাবড়ির প্রধান উপাদান।
১৪। সূর্যের অন্য নাম।
১৫। এই সময়ের ফল আম, জাম, কাঁঠাল।
১৮। পুজোর সময় এই শাড়ি পরতে হয়।
২১। বাংলা সাল।
২২। নিযুক্ত।
২৩। বিচার করেন যিনি।
২৪। জনগণের রাগ।
২৫। বেশ দশাসই চেহারার লোক।

উপর-নীচ

২। বাহারি।
৩। রাগ-রাগিণীর প্রধান সুর।
৪। কালীর একটি রূপ।
৫। ভেজানো।
৭। ঝোঁক।
৯। একটি দক্ষিণী খাবার।
১০। ঘোড়া।
১২। কর দেয় যে রাজ্য।
১৬। মাধুর্যের কথ্য রূপ।
১৭। চিত্ত।
১৮। আগ্রহ।
১৯। মণিমাণিক্যের কথ্য রূপ।
২০। বাঁশের তৈরি শিকারির বসার জায়গা।
২৩। গরল।

গত সংখ্যার সমাধান

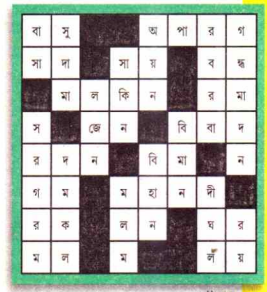

শালুক

কাগুজে অক্টোপাস

নিজের হাতে

উপকরণ: এ ফোর সাইজের রঙিন কাগজ, পেন বা পেনসিল, আঠা, কাঁচি।

কীভাবে করবে:

১। এ ফোর সাইজের রঙিন কাগজ নিয়ে ১ নং ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে একটা বর্গাকার আর একটা আয়তাকার টুকরো কেটে ফেলে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, সবচেয়ে বড় টুকরোটার একপাশে যেন একটু বর্ধিত অংশ থাকে (১ নং ছবির মতো)।

২। কাগজের বাকি অংশটার একপাশে ছবি অনুযায়ী পাশাপাশি আটটা টুকরো কেটে নিতে হবে। এই অংশগুলো যদিও মূল কাগজ থেকে আলাদা করা যাবে না।

৩। এবার মূল কাগজের যে বর্ধিত অংশটা ছিল, সেটা ধরে কাগজটা গোল করে মুড়িয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে নিতে হবে। তা হলেই পাওয়া যাবে অক্টোপাসের দেহ।

৪। এবার যেভাবে ২ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে, সেভাবে অক্টোপাসের শুঁড়গুলোকে পেনসিল দিয়ে মোড়ালেই গোল্লা-গোল্লা শুঁড় পেয়ে যাবে।

৫। এবার দুটো সাদা গোল কেটে অক্টোপাসের মাথায় লাগিয়ে মাঝে দুটো কালো গোল এঁকে দিলেই পেয়ে যাবে অক্টোপাসের চোখ।

৬। মুখ আর শুঁড়ের গায়ের দাগ পেনসিল বা পেন দিয়ে এঁকে নিলেই তৈরি তোমার অক্টোপাস!

বৈশালী সরকার

১

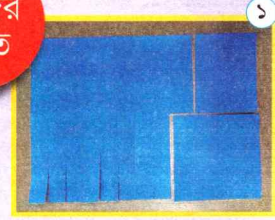

২

তিব্বতি ভাইরাস

১৯৯২ সালে তিব্বতের এক হিমবাহ থেকে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য জমাট বরফ সংগ্রহ করা হয়েছিল। ২৩ বছর পর, ২০১৫ সালে সেই একই হিমবাহ থেকে আবার কিছু জমাট বরফ

আনা হল। দুটো নমুনাই রেখে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে পরীক্ষা করার জন্য। এদের মধ্যে প্রথম নমুনাটি নাকি ১৫০০ বছর প্রাচীন। সম্প্রতি মার্কিন মুলুকের একদল গবেষক দু'টি নমুনাকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঝেড়েমুছে পরীক্ষা করেছেন। আর সেই পরীক্ষার ফল দেখেই আতঙ্কে শিউরে উঠেছেন ওঁরা। দেখা গিয়েছে, ওই দু'টি নমুনায় জমাট বেঁধে ছিল ৩৩ রকমের ভাইরাস, যার মধ্যে ২৮টিই আমাদের অচেনা! বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে যে-হারে সারা পৃথিবীর হিমবাহ গলছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে বরফ গলে অচেনা মারণ ভাইরাসের দল পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লে কী হবে, সেই ভেবে রাতের ঘুম উড়েছে পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানীদের।

বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞানের নানা শাখায় নিরন্তর ঘটে চলেছে নানা ঘটনা। তারই কিছু খবর রইল এই পাতায়।

পায়ে হাঁটা হাঙর

হাঁসজারু বা বকচ্ছপের মতো আজগুবি শোনাচ্ছে কি? হাঙরদের কোনও-কোনও জাতভাই যে পায়ে হাঁটে, এ কিন্তু আমরা জানতাম আগেই। পা মানে তো আর মানুষের মতো লম্বা দুটো ঠ্যাং নয়। আসলে ছোট্ট-ছোট্ট পাখনার সাহায্যে সমুদ্রের তলায় চলাফেরা করে এরা। বিজ্ঞানীরা জানতে চাইছিলেন, কীভাবে এরা বিবর্তিত হয়েছিল। সেই খোঁজে নেমেই ইন্দোনেশিয়ার পূর্বদিকের সমুদ্রে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে পায়ে-হাঁটা-হাঙরের চারটি নতুন প্রজাতি। ব্যাপারটা গুরুতর, কারণ হাঙররা পৃথিবীতে আছে ৪০ কোটি বছর ধরে। অর্থাৎ, প্রায় ২৪ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়ানো ডায়নোসরদের চেয়েও তারা ঢের প্রাচীন। এদিকে তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের জলতল এবং তার তাপমাত্রা বাড়া-কমার কারণে এই খুদে হাঙররা নিজেদের জাতভাইদের চেয়ে আলাদা হয়েছিল আজ থেকে মাত্র এক কোটি বছর আগে। তা হলে যে এতদিন জানতাম, হাঙরের বিবর্তন খুব ধীরে-ধীরে হয়? তা কি সত্যি নয়? ফাঁপরে পড়লে একরত্তি হাঙরও পারে নিজেকে হু হু করে বদলে ফেলতে? সদ্য আবিষ্কৃত এই খুদে হাঙররা তুলে দিল এমন বহু প্রশ্ন।

অচ্যুত দাস

মহাকাশে যাবে ব্যোম মিত্র

২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র ইসরো 'গগনযান' নামের মহাকাশযানে মানুষকে মহাকাশে পাঠাতে চায়। মহাকাশে মানুষ পাঠানোর আগে অনেক দেশই কুকুর-বিড়ালের মতো প্রাণীকে সেখানে পাঠিয়ে দেখেছে। ইসরোর পরীক্ষামূলক উড়ানে যার মহাকাশে যাওয়ার কথা, তার অবশ্য নাম থাকলেও শরীরে প্রাণ নেই। ইসরোর তৈরি 'ব্যোম মিত্র' নামের এই কৃত্রিম বুদ্ধিধারী রোবট হাফ-হিউম্যানয়েড। মানুষের মতো দেখতে রোবটকে হিউম্যানয়েড বলে। ব্যোম হাফ-হিউম্যানয়েড, কারণ তার মাথা, দু'হাত, বুক ও পেট থাকলেও শরীরের নিম্নাংশ নেই। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সে জানিয়েছে, অন্ত্রোপচার থেকে শুরু করে সুইচ প্যানেল সারানোর মতো নানা কাজে সে পারদর্শী। আপাতত রাত-দিন এক করে তাকে নিখুঁত করে তোলা হচ্ছে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের রোবোটিক্স ল্যাবরেটরিতে।

নাচুনে ড্রাগন

১২ কোটি বছর আগে চিন দেশে ঘুরে বেড়াত পালকে ঢাকা, লম্বা লেজের এক খুদে ডায়নোসর। বিজ্ঞানীরা তার যে নাম দিয়েছেন, ইংরেজিতে তার মানে, 'ডান্সিং ড্রাগন'। দাঁড়কাকের আকারের খুদে এই ডায়নোর অপূর্ব এক জীবাশ্ম প্রায় এক দশক আগে খুঁজে পাওয়া গেলেও এতদিন তা পড়েছিল চিনের এক জাদুঘরে। সম্প্রতি মার্কিন মুলুকের একদল গবেষক ওই জীবাশ্ম পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, পাখিদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে অদ্ভুত মিল ছিল ছোট্ট পালকে ঢাকা, ডানাওয়ালা এই প্রাণীর। জানা গিয়েছে, চিনের ওই জীবাশ্ম যে ডান্সিং ড্রাগনের, মারা যাওয়ার সময় সে ছিল অল্পবয়সি। সরীসৃপরা কীভাবে বিবর্তিত হয়ে পাখিতে রূপান্তরিত হল, সেই অনুসন্ধানে এই ডান্সিং ড্রাগনের জীবাশ্ম বিজ্ঞানীদের দিয়ে গেল একগুচ্ছ সংকেত!

দীপসুন্দর দিন্দা

আনন্দমেলার কুইজ় বিভাগের প্রশ্ন করছেন 'দাদাগিরি আনলিমিটেড সিজ়ন সিক্স'-এর বিজয়ী দীপসুন্দর দিন্দা।

1 এই বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিকের লেখা কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'কালের মন্দিরা', 'গৌড়মল্লার', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'কুমারসম্ভবের কবি'। কোন সাহিত্যিক?

2 টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একমাত্র কোন বোলার ১৫০টি ম্যাচ খেলেছেন?

3 ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা বা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত সাস-বহু মন্দির ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?

4 আমরা জানি, রামায়ণে রামচন্দ্র বানররাজ বালিকে বধ করেছিলেন। এই বালির পুত্র একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন, যিনি রামচন্দ্রের সৈন্যদলের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর নাম কী?

5 আমাদের রাজ্যের কোন শৈলশহরের নামের অর্থ 'সাদা অর্কিডের দেশ'?

6 এটি একটি রাসায়নিক যৌগ, যার সংকেত $C_{14}H_9Cl_5$। এটি অনেক আগে আবিষ্কৃত হলেও মূলত মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত। ১৯৪৮ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী পল মুলার একে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করেন। কোন জিনিস?

7 'গীতগোবিন্দম' কাব্যের রচয়িতা কবি জয়দেব কোন বাঙালি সম্রাটের সভাকবি ছিলেন?

8 সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কোন বাংলা চলচ্চিত্রের ইংরেজি সংস্করণের নাম 'এলিফ্যান্ট গড'?

9 পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত গম্ভীর সিংহ মুড়া কোন নৃত্যের জন্য পরিচিত?

10 আমাদের দেশের কোন সশস্ত্র প্রতিরক্ষা বাহিনীটি ১৯৬৫ সালে স্থাপিত, যার মোটো 'ডিউটি আনটু ডেথ'?

৫ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

১। বীরভূমের কোপাই নদী।

২। কুলদীপ যাদব।

৩। সন্দীপনী মুনি।

৪। যোধপুর।

৫। গ্রেটা থুনবার্গ।

৬। ওজোন স্তর।

৭। নোমোফোবিয়া।

৮। মেঘালয়।

৯। কীর্তন গান।

১০। কথাসরিৎসাগর।

সঠিক উত্তরদাতা

দেবমাল্য বণিক, *পঞ্চম শ্রেণি, শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির, হুগলি।*

সমৃদ্ধি পাত্র, *অষ্টম শ্রেণি, কারমেল স্কুল, সারেঙ্গাবাদ।*

ইমন পড়িয়া, *সপ্তম শ্রেণি, পাঁশকুড়া বি বি হাই স্কুল।*

গৌরব দে, *অষ্টম শ্রেণি, নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়, নদিয়া।*

রোদসী চক্রবর্তী, *সপ্তম শ্রেণি, সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দির, সিউড়ি।*

উত্তর পাঠাও ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। আমাদের ঠিকানা 'আনন্দমেলা আমার কুইজ়' বিভাগ। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১।

আমার স্কুলের খুদে প্রতিভা

আনন্দমেলা আয়োজিত এই স্কুলভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যার বিষয় ছিল 'আমার মনের মতো কেক'। এই সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল অনেক স্কুল, তাদের মধ্যে যে স্কুলগুলো খুব ভাল ফল করেছে, তাদের কিছু নাম গত সংখ্যায় (২০ জানুয়ারি, ২০২০) প্রকাশিত হয়েছে। আরও যে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভাল এঁকেছে, তারা হল অঙ্কন আর্ট আকাদেমি, কলকাতা, কারমেল স্কুল, দুর্গাপুর, অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, দুর্গাপুর, উত্তরায়ণ আর্ট স্কুল, কলকাতা, মডার্ন পাবলিক স্কুল, চন্দননগর, রং রেখা, শিবপুর, চিলড্রেন আর্ট সেন্টার, বাগুইআটি, জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন, কলকাতা, তুলিকা আর্ট ইনস্টিটিউট, কলকাতা এবং আর্ট প্রগ্রেস, কলকাতা। এছাড়াও আরও বহু স্কুল থেকে অসংখ্য অপূর্ব ছবি আমরা পেয়েছি এবং তাদের মধ্যে থেকে সেরা ছবি বেছে নিয়েছি, যেগুলো পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। স্কুলগুলো থেকে পাওয়া এন্ট্রি থেকে বেছে নেওয়া সেরা ১৫টি ছবি এই সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের নাম, শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের নামসহ প্রকাশ করা হল :

১. **ঈশানী দত্ত, সপ্তম শ্রেণি, অঙ্কন আর্ট আকাদেমি, কলকাতা।**
২. **অর্চিস্মিতা দে**, *সপ্তম শ্রেণি, কারমেল স্কুল, দুর্গাপুর।*
৩. **রোশনি বন্দ্যোপাধ্যায়**, *অষ্টম শ্রেণি, কারমেল স্কুল, দুর্গাপুর।*
৪. **দেবলীনা ঘোষ**, *অষ্টম শ্রেণি, অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, দুর্গাপুর।*
৫. **মধুপর্ণা দাস**, *সপ্তম শ্রেণি, উত্তরায়ণ আর্ট স্কুল, কলকাতা।*
৬. **সঞ্জনা দাস**, *অষ্টম শ্রেণি, উত্তরায়ণ আর্ট স্কুল, কলকাতা।*
৭. **অভিষেক সাউ**, *ষষ্ঠ শ্রেণি, মডার্ন পাবলিক স্কুল, চন্দননগর।*
৮. **নন্দিনী জানা**, *অষ্টম শ্রেণি, রং রেখা, শিবপুর।*
৯. **সৃষ্টি মুখোপাধ্যায়**, *সপ্তম শ্রেণি, কারমেল স্কুল, দুর্গাপুর।*
১০. **সমীর গুপ্ত**, *সপ্তম শ্রেণি, অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, দুর্গাপুর।*
১১. **চিরন্তন সিংহ**, *দ্বিতীয় শ্রেণি, চিলড্রেন আর্ট সেন্টার, বাগুইআটি।*
১২. **সায়ন ধাড়া**, *তৃতীয় শ্রেণি, জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন, কলকাতা।*
১৩. **বিবেক ভান্ডারী**, *তৃতীয় শ্রেণি, জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন, কলকাতা।*
১৪. **হেমাংশু প্রসাদ**, *প্রথম শ্রেণি, তুলিকা আর্ট ইনস্টিটিউট, কলকাতা।*
১৫. **অ্যাঞ্জেলিনা লোবো**, *দ্বিতীয় শ্রেণি, আর্ট প্রগ্রেস, বাগুইআটি।*

প্রথম

ঈশানী দত্ত
সপ্তম শ্রেণি
অঙ্কন আর্ট আকাদেমি, কলকাতা।

দ্বিতীয়

অর্চিস্মিতা দে
সপ্তম শ্রেণি
কারমেল স্কুল, দুর্গাপুর।

তৃতীয়

রোশনি বন্দ্যোপাধ্যায়
অষ্টম শ্রেণি
কারমেল স্কুল, দুর্গাপুর।

চতুর্থ

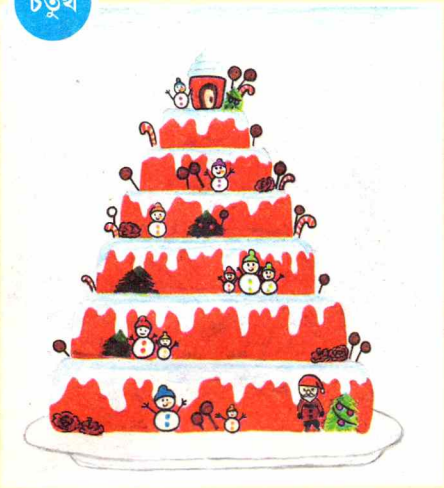

দেবলীনা ঘোষ
অষ্টম শ্রেণি
অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, দুর্গাপুর।

পঞ্চম

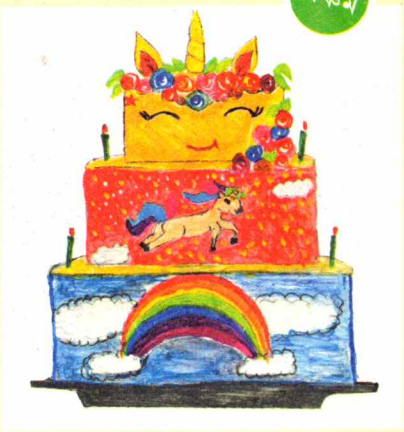

মধুপর্ণা দাস
সপ্তম শ্রেণি
উত্তরায়ণ আর্ট স্কুল, কলকাতা।

ষষ্ঠ

সঞ্জনা দাস
অষ্টম শ্রেণি
উত্তরায়ণ আর্ট স্কুল, কলকাতা।

সপ্তম

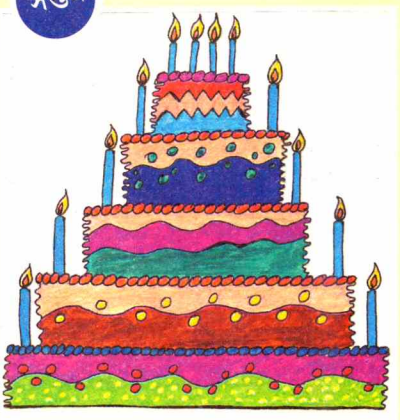

অভিষেক সাউ
ষষ্ঠ শ্রেণি
মডার্ন পাবলিক স্কুল, চন্দননগর।

অষ্টম

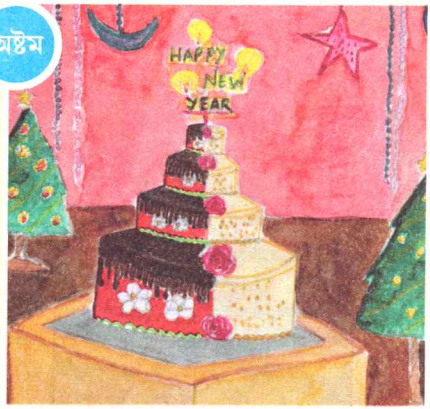

নন্দিনী জানা
অষ্টম শ্রেণি
রং রেখা, শিবপুর।

নবম

সৃষ্টি মুখোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি
কারমেল স্কুল, দুর্গাপুর।

দশম

সমীর গুপ্ত
সপ্তম শ্রেণি
অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, দুর্গাপুর।

একাদশ

চিরন্তন সিংহ
দ্বিতীয় শ্রেণি
চিলড্রেন আর্ট সেন্টার, বাগুইআটি।

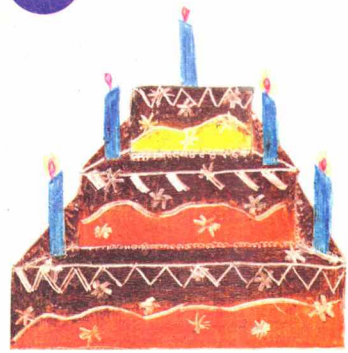

দ্বাদশ

সায়ন ধাড়া
তৃতীয় শ্রেণি
জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন, কলকাতা।

ত্রয়োদশ

বিবেক ভান্ডারী
তৃতীয় শ্রেণি
জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন, কলকাতা।

চতুর্দশ

হেমাংশু প্রসাদ
প্রথম শ্রেণি
তুলিকা আর্ট ইনস্টিটিউট, কলকাতা

পঞ্চদশ

অ্যাঞ্জেলিনা লোবো
দ্বিতীয় শ্রেণি
আর্ট প্রগ্রেস, বাগুইআটি।

ফারাক পাও

দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

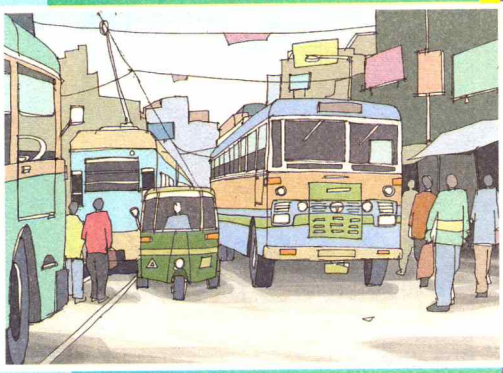

ছবি: প্রীতম দাশ

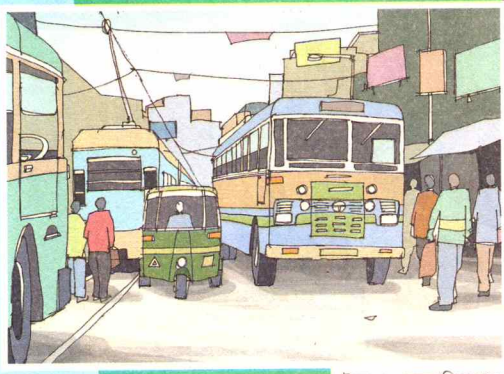

উত্তর: ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তর

১। হলুদ গাড়ির ব্যাকলাইট উলটে গিয়েছে।
২। দূরের গাড়িটির হেডলাইট উলটে গিয়েছে।
৩। দূরের একটি লাইটপোস্ট সরে গিয়েছে।
৪। সামনের গাড়ির লুকিং গ্লাসটি নেই।
৫। সামনের গাড়ির ইন্ডিকেটর লাইটটি সরে গিয়েছে।
৬। উপরের বাড়িটির একটি জানলা নেই।
৭। হলুদ গাড়ির সিঁড়িটি বদলে গিয়েছে।
৮। দূরের একটি সাইনবোর্ডের রং বদল।

সুদোকু

৪		৮			২	৬		
২						৩		
			৬			৪	৭	
		৪		১				
	৩	১	৮		৪	৯	৬	
				৬		১		
	৭	৫			৯			
		৬						৭
		২	৭			৮		৩

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

১	২	৮	৩	৪	৯	৭	৬	৫
৩	৪	৫	২	৬	৭	১	৯	৮
৭	৯	৬	৮	১	৫	২	৪	৩
৬	৩	৪	৯	২	৮	৫	৭	১
২	৭	৯	৪	৫	১	৮	৩	৬
৫	৮	১	৬	৭	৩	৯	২	৪
৮	১	৩	৭	৯	৪	৬	৫	২
৪	৬	৭	৫	৮	২	৩	১	৯
৯	৫	২	১	৩	৬	৪	৮	৭

রাহুলের দাপট

ভারতীয় দলে উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানের দ্বৈত ভূমিকা পালন করছেন লোকেশ রাহুল। তাঁর কথা লিখেছেন **জয়াশিস ঘোষ**

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ। ব্যাট করার সময় প্যাট কামিন্সের বলে হেলমেটে আঘাত পান ভারতের উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ। চোটের ফলে আর উইকেটের পিছনে দাঁড়াতে পারেননি তিনি। কী হবে এবার? সুযোগ দেওয়া হল কে এল রাহুলকে। ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং আই পি এল-এ তাঁকে এর আগে উইকেটরক্ষকের ভূমিকায় দেখা গেলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেভাবে উইকেটের পিছনে দেখা যায়নি তাঁকে। অতএব বিরাট সুযোগ। দলের দুর্দিনে সেই সুযোগ পেয়েই তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করলেন সাফল্যের সঙ্গে। শুধু কি তাই? ব্যাট হাতেও নিজের কাজ করেছেন ঠিক-ঠিকভাবে। গোটা ইনিংসে দলের প্রয়োজনে কখনও ব্যাট করতে নেমেছেন তিন নম্বরে, কখনও বা ইনিংসের শুরু থেকেই দলের হাল ধরেছেন। এর সুবাদে নিউজ়িল্যান্ড সিরিজ়েও দলের সঙ্গে গিয়েছেন উইকেটরক্ষক হিসেবে। আর প্রথম দু'টি টি২০-তেই দলের জয়ের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি করে ফেলেছেন বিশ্বরেকর্ড। এই প্রথম আন্তর্জাতিক টি২০-তে তিনি উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে খেললেন, আর পরপর দু'টি ম্যাচেই করলেন অর্ধশতরান। এই কীর্তি বিশ্বের আর কোনও খেলোয়াড়ের নেই।

স্বাভাবিকভাবেই এখন আলোচনার কেন্দ্রে রাহুল। গত বছর বিশ্বকাপের পর থেকে ভারতীয় দলের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার জায়গা হল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির উত্তরসূরি হিসেবে একজন যোগ্য উইকেটরক্ষক খুঁজে বের করা। সেই কাজটা ঋষভ পন্থকে দিয়ে করানোর চেষ্টা হলেও তিনি যে পুরোপুরি সফল হচ্ছিলেন, তা বলা যায় না। তাঁর জায়গায় বেশ শক্ত হাতেই হাল ধরেছেন রাহুল। ফলে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে, এবার কি তা হলে ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল' রাহুল দ্রাবিড়ের মতো উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যানের দ্বৈত ভূমিকায় দেখা যাবে লোকেশ রাহুলকে? আই পি এল এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন রাহুল। কিন্তু তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মঞ্চকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য রাহুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আলাদা-আলাদা ব্যাটিং অর্ডারে যেভাবে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছেন, তাতে তাঁর প্রতিভার ব্যাপারে সকলেই নিঃসন্দেহ। তাঁর টেকনিক, শট নির্বাচন বা চাপ নেওয়ার ক্ষমতা নিয়েও বলার কিছু নেই। তবুও রাহুলকে এখনই এতটা চাপ দেওয়া ঠিক হবে কিনা, সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি নিজে অবশ্য বলছেন, এই দ্বৈত ভূমিকা তিনি ভালই উপভোগ করছেন। কিন্তু অনেকসময়ই উইকেটকিপিং করে উঠে ওপেন করতে হচ্ছে রাহুলকে। এক্ষেত্রে পরিশ্রম বেশি হওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রভাব পড়তে পারে তাঁর ব্যাটিংয়ে। কাজেই নির্বাচকরা যদি রাহুলের থেকে নিয়মিত বড় রান আশা করে থাকেন, তা হলে তাঁকে উইকেটরক্ষকের গুরুদায়িত্ব না দেওয়াই ভাল বলে মত অনেকের। একথাও উঠছে যে, তাঁর এই মারকাটারি পারফরম্যান্সের ফলে নড়ে গিয়েছে জাতীয় দলে ঋষভ পন্থের জায়গা। ২০১৪ সাল থেকে ভারতের জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দেখা যাচ্ছে রাহুলকে। এর মধ্যে গত বছরের শুরুতে নানা কারণে প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছিল তাঁর কেরিয়ার। সেখান থেকে ফিরে ব্যাট হাতে নিজেকে প্রমাণ করেছেন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে। এবার কি উইকেটরক্ষক হিসেবেও তাঁর জায়গা পাকা হবে? সেটা সময়ই বলবে।

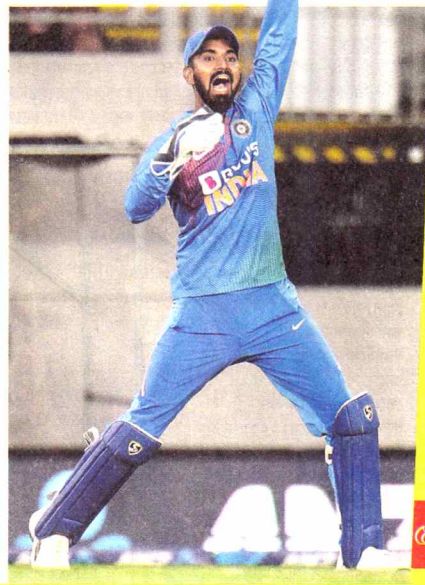

ছোট ছোট খেলা

আমাদের রাজ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটছে খেলাধুলোর নানা ঘটনা। তার ঝলক থাকল এখানে।

মোমোতোর নজরে অলিম্পিক্স

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের এক নম্বর তারকা তিনি। তাঁর সাফল্যের ঝুলিতে রয়েছে দু'টি বিশ্বকাপ টাইটেল, দু'টি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও একটি অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের সোনা। তবে এই জাপানি শাটলার কেন্তো মোমোতো কেরিয়ারে যে ৩৩টি টাইটেল জিতেছেন, তার মধ্যে অলিম্পিক্স পদক নেই। তাই আসন্ন টোকিয়ো অলিম্পিক্সকেই পাখির চোখ করেছেন মোমোতো। সদ্য ডেনমার্কের প্রতিযোগীকে হারিয়ে মালয়েশিয়া মাস্টার্স জিতেছেন। কিন্তু তার পরেই কুয়ালা লামপুরের কাছে এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর গাড়ির চালক প্রাণ হারালেও অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এখন বিশ্রামে রয়েছেন। গত মরশুমটা কোর্টে নেমে দারুণ ছন্দে ছিলেন মোমোতো। ২৫ বছরের এই শাটলার বিশ্বখেতাব, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, অল ইংল্যান্ড ওপেন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনিই এখন ব্যাডমিন্টনের বিশ্বশাসক। আগামী মার্চে অল ইংল্যান্ড ওপেন। জুলাইয়ে টোকিয়ো অলিম্পিক্স। বড় প্রতিযোগিতার আগে গাড়ি দুর্ঘটনা এই বাঁহাতি শাটলারের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটা বড় ধাক্কা। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠাই মোমোতোর কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

মিলানে ফিরলেন ইব্রা

পুরনো ক্লাব এসি মিলানে ফিরছেন, এমন জল্পনা ছিলই। অবশেষে ইতালির সিরি এ লিগে এসি মিলানের জার্সি গায়ে আবার নেমে পড়েছেন তিনি। সুইডিশ ফুটবল তারকা জ্বলাটান ইব্রাহিমোভিচ এর আগে শেষবার ইউরোপে খেলেছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে। ২০১৮-য় চলে যান লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিতে। মেজর লিগের এই দলটির সঙ্গে ইব্রার চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর গত মরশুমে ফাল ফর্মে থাকা ৩৮ বছরের এই ফুটবলারকে দ্বিতীয়বার দলে নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে মিলান। ২০১১ সালের পর থেকে এসি মিলান দেশের বড় কোনও ট্রোফি জেতেনি। চলতি মরশুমে দল সিরি এ-তেও একেবারেই ভাল অবস্থায় নেই। কঠিন সময়ে দলের হাল ফেরাতে ফর্মে থাকা ইব্রা-ই এখন মিলানের বড় ভরসা। ৮৫ ম্যাচে মিলানের হয়ে আগে ৫৬ গোল আছে তাঁর। বয়সটা বেড়েছে। তবু চ্যালেঞ্জ নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন ইব্রা।

অবসর ভাঙছেন ক্লিস্টার্স

পেশাদার টেনিস কোর্ট থেকে অবসর নেওয়া, আবার ফিরে এসে জয় তুলে নেওয়া তাঁর কাছে কোনও কঠিন কাজ নয়। সেটাই যেন বারেবারে প্রমাণ করতে চান বেলজিয়ান টেনিস তারকা কিম ক্লিস্টার্স। টেনিস জীবনে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলস এবং দু'টি ডাবলস জিতেছেন। ৩৬ বছরের এই খেলোয়াড় আগামী মার্চে মেক্সিকো ওপেন দিয়ে আবার সার্কিটে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক সময় সিঙ্গলস এবং ডাবলস, দু'টিতেই বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে ছিলেন এক নম্বরে। মা হওয়ার পরেও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। প্রথমবার অবসর নেন ২০০৭ সালে। ২০০৯ সালে অবসর ভেঙে ফিরে আসেন। দ্বিতীয়বার অবসর নেন ২০১১ সালে। ওই বছরই জেতেন অস্ট্রেলীয় ওপেন।

ফোটো: লেখক

জাতীয় গ্রোবলে দিল্লির দাপট

অনেক বছর পর বাংলায় বসেছিল ৪২তম জাতীয় সিনিয়র গ্রোবলের আসর। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা, দু'টি বিভাগেই দাপট দেখিয়ে চ্যাম্পিয়নের খেতাব জিতে নিয়ে গেল দিল্লি। পূর্ব বর্ধমানের রথতলা প্রভাত প্রগতি সংঘের মাঠে চারদিনের এই প্রতিযোগিতা ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। চ্যাম্পিয়ন দিল্লি, আয়োজক বাংলা ছাড়াও এই জাতীয় প্রতিযোগিতায় ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, বিহার, রাজস্থান, ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ডসহ ছেলেদের ১৮টি এবং মেয়েদের ১৬টি দল অংশ নেয়। নিজেদের মাঠে বাংলার মেয়েরা কোয়ার্টার ফাইনালে হরিয়ানার কাছে হেরে বিদায় নিলেও, ছেলেরা ফাইনালে দিল্লির মুখোমুখি হন। কিন্তু ফাইনালে ১৫-৮ ও ১৫-১২ ফলে ম্যাচ জিতে দিল্লি চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায়। মেয়েদের ফাইনালে দিল্লি হারিয়ে দেয় ওড়িশাকে। তবে দু'টি বিভাগেরই সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার যায় ওড়িশায়। পুরুষ বিভাগে সেরা হন সূর্যকান্তি স্বামী। মহিলা বিভাগে শুভাদর্শিনী জানা।

বিশ্বকাপ চান রিচা

এই মুহূর্তে তাঁর সহপাঠীরা যখন মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, বাংলার উদীয়মান ক্রিকেটার রিচা ঘোষ তখন উড়ে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের আগেই টি২০ বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত কৌরদের ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে ডাক পেয়েছেন ১৬ বছরের এই মেয়ে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ অস্ট্রেলিয়ায় মেয়েদের টি২০ বিশ্বকাপ। ভারতের গ্রুপে রয়েছে আয়োজক অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। গত টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল ভারতের মেয়েরা। এবার তাই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন স্মৃতি মন্ধানা, দীপ্তি শর্মা, জেমাইমা রডরিগেজ়, পুনম যাদবরা। ঋদ্ধিমান সাহার শহর শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির মেয়ে রিচার ক্রিকেটে হাতখড়ি স্থানীয় বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে। বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ সি এ বি-র স্থানীয় ক্রিকেটে আম্পায়ারিং করেন। মূলত ব্যাটসম্যান হলেও উইকেটকিপিংয়ের সঙ্গে পেস বোলিংও রপ্ত করেছেন রিচা। অনূর্ধ্ব ১৯, অনূর্ধ্ব ২৩ বাংলা দলে খেলার পর সিনিয়র বাংলা দলে সুযোগ পান। টি২০ চ্যালেঞ্জার্স ট্রোফিতেও খেলেছেন। মিডল অর্ডারে তাঁর ব্যাট জাতীয় নির্বাচকদের নজর এড়ায়নি। এখন শুধু বিশ্বকাপ শুরুর অপেক্ষা।

নজর কাড়ছেন প্রিয়ঙ্কা

দীপা কর্মকারের মতোই আর-এক ত্রিপুরা কন্যা জিমন্যাস্টিক্সে নজর কাড়তে শুরু করেছেন। সদ্য গুয়াহাটিতে তৃতীয় 'খেলো ইন্ডিয়া' গেমসে চারটি সোনা জিতে সাড়া ফেলেছেন ১৫ বছরের এই মেয়ে। অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে অল রাউন্ডে সোনা জিতেছেন প্রিয়ঙ্কা দাশগুপ্ত। মাত্র চারবছর বয়সে ত্রিপুরার বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে দীপার দ্রোণাচার্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীর স্ত্রী, কোচ সোমা নন্দীর কাছে প্রিয়ঙ্কার জিমন্যাস্টিক্সে হাতেখড়ি। এই মুহূর্তে বিশ্বেশ্বরবাবুর কাছেই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন গরিব ঘরের এই মেয়ে। বাবা বেসরকারি গাড়ির চালক। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রিয়ঙ্কার নজরে ২০২৪-এর প্যারিস অলিম্পিক্স।

শৈলেন মান্না ফুটবলে সেরা ভবানীপুর

বেহালার পর্ণশ্রীতে একঝাঁক খুদে ফুটবলারের লড়াইয়ে জমে উঠেছিল এবারের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় অনূর্ধ্ব ১৫ ফুটবল প্রতিযোগিতা। পদ্মশ্রী শৈলেন মান্না নার্সারি ফুটবল আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত এই স্মৃতি গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হল কলকাতা ময়দানের ভবানীপুর ক্লাব। ২০১০ সালে শৈলেন মান্নার নামে ফুটবল আকাদেমির সূচনা হয়েছিল। জীবিত থাকতেই দেশের কিংবদন্তি এই ফুটবলার নিজের নামে ফুটবল আকাদেমির উদ্বোধন করেছিলেন। সেই থেকে এখানে চলছে নতুন-নতুন ফুটবলার তুলে আনার কাজ। আকাদেমির সচিব গৌতম দাস বললেন, "ইতিমধ্যে এই প্রতিযোগিতা সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং আই এফ এ অনুমোদন পেয়েছে। শৈলেন মান্না আকাদেমির চার ফুটবলার আগামী মরশুমে অনূর্ধ্ব ১৫ ইস্টবেঙ্গলে খেলার জন্য ডাক পেয়েছে।" চারটি গ্রুপে ১৬টি দল নিয়ে হল এবারের স্মৃতি গোল্ড কাপ। ভিন রাজ্যের অসম ফুটবল আকাদেমি, ছত্তীশগঢ় ফুটবল আকাদেমির সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিল আয়োজক আকাদেমি, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, এভিনিউ সম্মিলনী, সাদার্ন সমিতি, দুখীরাম ফুটবল কোচিং সেন্টার, শ্যামনগরের অ্যারোজ় ইউনাইটেডের মতো দল। ফাইনালের ফলাফল টাইব্রেকারেও নিষ্পত্তি না হলে শেষে টসে ভবানীপুরের খুদেরা অ্যারোজ় ইউনাইটেডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। বিজয়ী দলের অধিনায়ক রৌনক পাল ম্যাচের সেরা হন। প্রাক্তন ফুটবলার বক্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সমাজপতি, সুব্রত ভট্টাচার্য, কুন্তলা ঘোষদস্তিদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুই বর্ষীয়ান কোচ অমিয় ঘোষ ও জহর দাস।

ফোটো: লেখক

চন্দন রুদ্র

নতুন খেলা

১

৩

২

৪

ছবিতে শব্দ খোঁজো

চারটি ছবি দেওয়া আছে। ছবি দেখে সেগুলোর বাংলা নাম পরপর খোপে লিখে ফ্যালো। এবার সেই শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হবে একটি বিশেষ শব্দ। শব্দটি তোমাদের পরিচিতই। পেলে খুঁজে?

এবারের সঙ্কেত : অমিল, হিসেবের ভুল।

১			
২			
৩			
৪			

ফু	ট	ব	ল
ল	ঙ্কা	গা	ছ
বা	গ	দে	বী
র	থ	যা	ত্রা

৫ জানুয়ারি সংখ্যার সমাধান

ফু ল দা নি

Go Figure

খোপের নীচে দেওয়া চারটি সংখ্যা যেমন খুশি প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম খোপে বসাও। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মধ্যে যে-কোনও চিহ্ন বসাও দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খোপে। যাতে অঙ্কটি কষলে ডান দিকে দেওয়া সংখ্যাটি তার ফল হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করবে। মনে-মনে বন্ধনীও ব্যবহার করতে পার। এই ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে।

÷ X + −

সহজ

							= ১
৫		৩		২		১	

মাঝামাঝি

							= ৩
২৪		১২		৪		২	

কঠিন

							= ৫১
৩৪		২৪		৮		২	

৫ জানুয়ারি সংখ্যার সমাধান :

সহজ : (২ × ৯ ÷ ৩) + ৪ = ১০
মাঝারি : (৭ × ৮) ÷ (৩০ - ২) = ২
কঠিন : (১২ ÷ ৪) × (৩১ - ২১) = ৩০

উপর-নীচ দুটো বিভাগের সঠিক উত্তর ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠালে তবেই সঠিক উত্তরদাতা হিসেবে তোমাদের নাম উঠবে।

স্বাগতা রায়, *শ্রেবন্তী রায়, ষষ্ঠ শ্রেণি, রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়, বারুইপুর।* **শিবাজী রায়,** *ষষ্ঠ শ্রেণি, বারুইপুর হাই স্কুল।* **গৌরব দে,** *অষ্টম শ্রেণি, নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়।* **দিশা গুড়িয়া,** *অষ্টম শ্রেণি, বাজকুল বলাইচন্দ্র বিদ্যাপীঠ, পূঃ মেদিনীপুর।* **ভূমিশ্রী দাস,** *সপ্তম শ্রেণি, নবপল্লী যোগেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যামন্দির, বারাসত।* **রাজর্ষি দাস,** *চতুর্থ শ্রেণি, বারাসত মহাত্মা গাঁধী স্মৃতি জি এস এফ পি বিদ্যালয়।* **সমৃদ্ধি পাত্র,** *অষ্টম শ্রেণি, কারমেল স্কুল, সারেঙ্গাবাদ।* **অভীক দাস,** *চতুর্থ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শিশুসদন, মালদা।* **রাজিয়া সুলতানা, তমোশ্রী কোলে,** *পঞ্চম শ্রেণি, বড়া মধুসূদন বালিকা বিদ্যালয়, সিঙ্গুর।* **ঋষিতা বসু,** *সপ্তম শ্রেণি, অলিগঞ্জ ঋষি রাজনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়, পঃ মেদিনীপুর।* **আশুতোষ শর্মা,** *অষ্টম শ্রেণি, সিস্টার নিবেদিতা ইনস্টিটিউট, হাওড়া।*

আমাদের চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থসম্ভার !!

বইমেলায় স্টল নং 341, 109 & 277

এছাড়া ছোটোদের উপযোগী বিভিন্ন ইংরেজি ও বাংলা গল্পের বই (সব বই রঙিন)

একশো বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প ২০০

মপাসাঁ রচনাবলী ৩০০

পৃথ্বীরাজ সেন সুভাষ থেকে নেতাজি ২২০ (জীবন-রাজনীতি-অন্তর্ধান রহস্য-কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গোপন ফাইল)

সহস্র এক আরব্য রজনী ৬০০

অচেনা অজানা আন্টার্কটিকা ৮০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

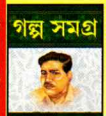

রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র ১ম-২য় প্রতি ১৭০

গল্পগুচ্ছ ১৮০ গীতবিতান ১৮০

রবীন্দ্র নাটক সমগ্র ১ম-২য় ২০০

রবি-কাদম্বরীর গোপন প্রেমের রূপকথা ৭০

সম্পূর্ণ রঙীন সংস্করণ চিত্র সহ

VETAL PANCHABINSHATI (বেতাল পঞ্চবিংশতি) ১০০

মিশর রহস্য ১০০

রহস্যময় ডাইনোসর ৮০

বিদ্যাসাগর ও বাংলার নবজাগরণ ১৬০

শতাব্দীর সেরা রোমান্টিক গল্প ২৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পসম(গ্র) ১ম ১৮০ ২য় ১৮০

উপন্যাস সমগ্র ১ম ২৫০ ২য় ২৫০

১৫০ বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প ২০০

বিশ্বের সেরা ভৌতিক গল্প ২০০

লেটেস্ট ক্যুইজ সমগ্র ১৮০

মনস্বী পুরুষসিংহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র (১ম) ৩০০ (২য়) ২৫০

অচেনা অজানা আমাজন ৮০

জুলেভার্ন রচনা সমগ্র ২২০

নির্বাচিত আগাথা ক্রিস্টি ১৫০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড) ২৩০ (সাহিত্য খণ্ড) ৩৫০

নানা পেশার দিশা ১২৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প সমগ্র (১ম) ৩০০ (২য়) ২৫০

সাগর দানবের বিভীষিকা ৯০

শাশ্বত ভাষণ সমগ্র ২৫০

HOLY CHILD Art Gallery

অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নিশ্চিত সাফল্যের জন্য অবশ্যই সংগ্রহ করুন

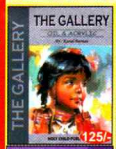

- Holy Child Subject Drawing
- Subjective Pastel • Pencil Drawing
- Jamini Roy • Indian Art Painting
- Water Colour Composition • Portrait
- Human Figure • Anatomy Drawing

THE GALLERY 125/- · Subject Drawing 70/- · Human Figure · Water Colour Composition · Beautiful 3 Water Colour 60/- · Study of Water Colour 100/- · New Pastel Scenery 70/- · Golden Composition in Water Colour 70/- · Kids Pastel 70/- · Excellent Water Colour 70/-

আমার শৈশব স্মরণিকা ১৭০ বিবেকানন্দ রচনাবলী ২০০ দুশো বছরের শ্রেষ্ঠ গল্প ১৮০ টেনসন ও জীবন যন্ত্রনা থেকে মুক্তির উপায় ১৬০ চাইল্ড সাইকোলজি ২০০ দশটি উপন্যাস ৪০০ পাঁচটি বিদেশী রহস্য উপন্যাস ২৫০

মহাভারতের ৩০ টি অজানা চরিত্র 160/-

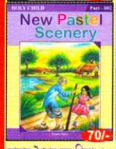

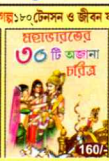

পাঁচটি বিদেশী রহস্য উপন্যাস: জেমস হ্যাডলি চেজ, আগাথা ক্রিস্টি, সিডনি সেলডন, অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন, নিক কার্টার

HOLY CHILD PUBLICATION / S.B.S. PUBLICATION

E-mail: holychildpublication@yahoo.co.in • Web: www.holychildpublication.co.in

32 & 30/1, Beniatola Lane, Kol-9 Ph.8648882977/8648851504/06 6289199827